পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ বার্হিষদৈরভিপূজিতঃ ।
পশ্যতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সন্দিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান**—সর্বশক্তিমান; **বার্হিষদৈঃ**—রাজা বর্হিষতের পুত্রদের দ্বারা; **অভি-পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **পশ্যতাম্**—সমক্ষে; **রাজ-পুত্রাণাম্**—রাজপুত্রদের ; **তত্র**—সেখানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরঃ**—শিব।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে বিদুর! এইভাবে ভগবান শিব রাজা বর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজপুত্রেরাও তখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শিবের পূজা করেছিলেন। তার পর ভগবান শিব রাজপুত্রদের সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়টিতে প্রাচীন কালের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর তত্ত্ব পাওয়া যায়। রাজা বর্হিষৎ যখন তাঁর রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণের কথা বিবেচনা করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের তপস্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা প্রজাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য আদর্শ রাজা হতে পারেন। সেই সময় রাজা বর্হিষৎ নিজেও দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে জড় জগৎ এবং তা ভোগ করতে ইচ্ছুক জীবদের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করছিলেন। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, রাজ্যভার গ্রহণ করার পূর্বে রাজা ও রাজপুত্রদের রাজকার্য পরিচালনার জন্য

কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। জনকল্যাণ-কার্যের লক্ষ্য ছিল ভগবানকে জানা। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং তাঁর সেবা করা। যেহেতু রাজারা প্রজাদের পারমার্থিক শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাই রাজা ও প্রজা উভয়েই কৃষ্ণভাবনায় সুখী থাকতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের রাজবংশ আসছে নারদ মুনির প্রখ্যাত শিষ্য এবং ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজ থেকে। মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ তখন বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকাম কর্মে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ উচ্চতর লোকে বা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তি তাতে লাভ করা যায় না। দেবর্ষি নারদ যখন দেখেছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজের বংশধর এইভাবে সকাম কর্মের দ্বারা পথভ্রষ্ট হচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং নিজে এসে জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তিযোগ সম্বন্ধে তাঁকে উপদেশ দেন। নারদ মুনি কিভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে পরোক্ষভাবে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা এখানে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্বে প্রচেতসঃ ।
জপন্তস্তে তপস্তেপুর্বর্ষাণামযুতং জলে ॥ ২ ॥

রুদ্র-গীতম্—শিব যে গান গেয়েছিলেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **স্তোত্রম্**—স্তোত্র; **সর্বে**—সমস্ত; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতা নামক রাজপুত্রগণ; **জপন্তঃ**—জপ করে; **তে**—তাঁরা সকলে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **তেপুঃ**—সম্পাদন করে; **বর্ষাণাম্**—বছর; **অযুতম্**—দশ হাজার; **জলে**—জলের ভিতর।

অনুবাদ

সমস্ত প্রচেতারা দশ হাজার বছর জলের ভিতর দাঁড়িয়ে, সেই রুদ্রগীত জপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজপুত্রেরা কিভাবে দশ হাজার বছর জলের ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই কথা শুনে আধুনিক যুগের মানুষেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আশ্চর্য হবে। কিন্তু, বায়ুর ভিতর থাকা অথবা জলের ভিতর থাকা একই রকম; তবে কিভাবে তা করতে হবে, তা

কেবল জানতে হয়। জলচর প্রাণীরা সারা জীবন জলের মধ্যে থাকে। জলের ভিতর থাকার জন্য তাদের কতকগুলি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হয়। তখনকার দিনে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। তার মধ্যে কেউ যদি দশ হাজার বছর তপস্যা করতেন, তা হলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন নিঃসন্দেহে সফল হত। সেটি খুব একটি আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। যদিও এই যুগে সেই প্রকার কার্য অসম্ভব, তবুও সত্যযুগে তা সম্ভব ছিল।

শ্লোক ৩

প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্মস্বাসক্তমানসম্ ।
নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৩ ॥

প্রাচীনবর্হিষম্—মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **আসক্ত**—রত; **মানসম্**—চিত্ত; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **অধ্যাত্ম**—আধ্যাত্মিক; **তত্ত্ব-জ্ঞঃ**—তত্ত্ববেত্তা; **কৃপালুঃ**—কৃপাপরবশ হয়ে; **প্রত্যবোধয়ৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাজপুত্রেরা যখন জলের ভিতর কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁদের পিতা বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। তাই তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তত্ত্ববেত্তা দেবর্ষি নারদ রাজার প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে, তাঁকে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মনস্থ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, *কৈবল্য* বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া, নরকে যাওয়ারই সমতুল্য, এবং স্বর্গ-সুখভোগ আকাশ-কুসুমের মতো। অর্থাৎ, ভক্ত কখনও কর্মী এবং জ্ঞানীদের যে চরম লক্ষ্য, তাতে কোন গুরুত্ব দেন না। কর্মীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া, এবং জ্ঞানীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। জ্ঞানীরা অবশ্য কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৪৭)। তাই ভক্ত কখনও কর্মমার্গে প্রবেশ করেন না। নারদ মুনি যখন দেখলেন যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তখন তিনি তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন।

ভৌতিক কার্যকলাপে লিপ্ত কর্মীদের থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার দ্বারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছেন যাঁরা, তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিতে কর্ম ও জ্ঞান দুটিকেই মায়ার মোহময়ী প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ৪

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্মণাত্মন ঈহসে ।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রেয়ঃ—চরম মঙ্গল; **ত্বম্**—আপনি; **কতমৎ**—তা কি; **রাজন্**—হে রাজন্; **কর্মণা**—সকাম কর্মের দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ঈহসে**—বাসনা করেন; **দুঃখ-হানিঃ**—সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি; **সুখ-অবাপ্তিঃ**—সমস্ত সুখের প্রাপ্তি; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **তৎ**—তা; **ন**—কখনই না; **ইহ**—এই প্রসঙ্গে; **চ**—এবং; **ইষ্যতে**—লাভ হয়।

অনুবাদ

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে রাজন্! এই সমস্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনি কি লাভ করতে চান? জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া এবং সুখভোগ করা, কিন্তু সকাম কর্মের দ্বারা তো তা লভ্য নয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে মহামায়া প্রকৃত বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে। মানুষ রজোগুণে কিছু লাভ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু সে জানে না যে, কাল তাকে চিরকালের জন্য কোন কিছু উপভোগ করতে দেবে না। মানুষ যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, তার তুলনায় তার যা লাভ হয় তা নিতান্তই নগণ্য। আর লাভ যদি হয়ও, তবুও তা ক্লেশবিহীন নয়। মানুষ যদি জন্মসূত্রে ধনী না হয় এবং সে যদি বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য জড়-জাগতিক বস্তু ক্রয় করতে চায়, তা হলে সেই জন্য তাকে বহু বছর ধরে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অতএব তার সুখ কখনই অনায়াসে লব্ধ নয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে নিরঙ্কুশ সুখ কখনই লাভ করা যায় না। আমরা যদি কোন কিছু উপভোগ করতে চাই, তা হলে সেই সুখ লাভের জন্য আমাদের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, এই জড় জগৎ দুঃখময়, আর

যে সুখ ভোগের চেষ্টা আমরা করি তা প্রকৃতপক্ষে মায়িক। আমাদের সকলকেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখভোগ করতে হয়। আমরা অনেক ভাল ভাল ওষুধ আবিষ্কার করে থাকতে পারি, কিন্তু ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃখ রোধ করা কখনই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে রোগ ও মৃত্যুকে ঔষধ প্রতিহত করতে পারে না। মোট কথা এই জড় জগতে সুখ নেই, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তথাকথিত সুখের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। বাস্তবিকপক্ষে, এই কঠোর পরিশ্রম করার পন্থাকেই সুখ বলে মনে করা হয়। সেটিই হচ্ছে মায়া।

তাই নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি এত ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, কি লাভ করতে চান। যদি কেউ স্বর্গলোকও প্রাপ্ত হয়, তবুও সে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। কেউ এখানে তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, ভক্তদেরও তো ভক্তিসাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয় এবং সেই জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। হ্যাঁ, নবীন ভক্তদের জন্য ভগবদ্ভক্তির সাধনা কষ্টদায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তত এই আশা রয়েছে যে, চরমে তারা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে, পরম আনন্দ লাভ করতে পারবে। সাধারণ কর্মীদের জন্য এই প্রকার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ তারা যদি স্বর্গলোকেও উন্নীত হয়, তবুও তারা যে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন কি ব্রহ্মাও, যিনি সর্ব্বোচ্চ লোকে (ব্রহ্মলোকে) অবস্থিত, তাঁরও মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এই জড় জগতে তিনিও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত নন। কেউ যদি এই সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন ! যিনি তত্ত্বত জানেন যে, আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর, এই জড় জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

এইভাবে পূর্ণ কৃষ্ণচেতনা লাভ করার পর, ভগবদ্ভক্তকে তাঁর মৃত্যুর পর আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। সেটিই হচ্ছে সুখের চরম অবস্থা, যাতে দুঃখের লেশ মাত্রও থাকে না।

শ্লোক ৫

রাজোবাচ

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্মাপবিদ্ধধীঃ ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্মভিঃ ॥ ৫ ॥

রাজা উবাচ—রাজা উত্তর দিলেন; **ন**—না; **জানামি**—আমি জানি; **মহা-ভাগ**—হে মহাত্মা; **পরম্**—দিব্য; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **অপবিদ্ধ**—বিদ্ধ হয়ে; **ধীঃ**—আমার বুদ্ধি; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে; **বিমলম্**—বিশুদ্ধ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যেন**—যার দ্বারা; **মুচ্যেয়**—মুক্ত হতে পারি; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্ম থেকে।

অনুবাদ

রাজা উত্তর দিলেন—হে মহাত্মা নারদ! আমার বুদ্ধি সকাম কর্মে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নই। দয়া করে আপনি আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান দান করুন। যার ফলে আমি সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

সৎ-সঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস ॥

মানুষ যতক্ষণ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। তাকে বলা হয় *কর্মবন্ধ-ফাঁস।* মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হোক অথবা পুণ্যকর্মে লিপ্ত হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ উভয়ই জড় দেহের বন্ধনের কারণ। পুণ্যকর্মের ফলে কেউ ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং সুন্দর দেহ ও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তার ফলে তার দুঃখকষ্ট চিরতরে নিবৃত্ত হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা অস্বাভাবিক নয়, এবং উচ্চশিক্ষা ও অত্যন্ত সুন্দর দেহ লাভ করাও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে দুঃখকষ্ট নেই। বর্তমানে পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতীদের যথেষ্ট শিক্ষা, সৌন্দর্য ও ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও, এবং যথেষ্ট খাবার, বেশভূষা ও ইন্দ্রিয়

সুখভোগের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত দুঃখী। প্রকৃতপক্ষে তারা এত দুঃখী যে, তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাদের এক অত্যন্ত দুঃখময় জীবন গ্রহণ করতে হচ্ছে। তাদের থাকবার কোন জায়গা নেই, অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নেই, এবং তারা অত্যন্ত নোংরাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং রাস্তায় ঘুমাতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তা থেকে বোঝা যায় যে, কেবল পুণ্যকর্ম করার ফলেই সুখী হওয়া যায় না। এমন নয় যে রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেই, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল পাপকর্ম অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সুখী হওয়া যায় না। এই প্রকার কার্যগুলি কেবল জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনের কারণ হয়। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাকে বলেছেন *কর্মবন্ধ-ফাঁস।*

মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ সেই কথা স্বীকার করে সরলভাবে নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে এই *কর্মবন্ধ-ফাঁস* থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের এই স্তরকে বেদান্ত-সূত্রের প্রথম শ্লোকে *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন *কর্মবন্ধ-ফাঁসের* চেষ্টায় হতাশ হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, যাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।* জীবনের চরম লক্ষ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে *বেদে* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১১/২/১২) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*— "দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু নারদ মুনিকে পেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর কাছে সেই জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যার দ্বারা *কর্মবন্ধ-ফাঁস* থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ। শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/১০) প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে *কর্মবন্ধ-ফাঁস* থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

শ্লোক ৬

গৃহেষু কূটধর্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু ॥ ৬ ॥

গৃহেষু—গৃহস্থ জীবনে; **কূট-ধর্মেষু**—কপট-ধর্মে; **পুত্র**—সন্তান-সন্ততি; **দার**—পত্নী; **ধন**—সম্পদ; **অর্থ**—জীবনের লক্ষ্য; **ধীঃ**—যিনি মনে করেন; **ন**—না; **পরম্**—

চিন্ময়; **বিন্দতে**—লাভ করেন; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **ভ্রাম্যন্**—ভ্রমণ করে; **সংসার**—জড় অস্তিত্বের; **বর্ত্মসু**—পথে।

অনুবাদ

যারা কেবল তথাকথিত সুন্দর জীবনের প্রতি আগ্রহশীল—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির বন্ধনে গৃহস্থরূপে ধন-সম্পদের অন্বেষণ করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তারা কেবল বিভিন্ন শরীরে সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়। তারা কখনই জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায় না।

তাৎপর্য

যারা স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ ও গৃহ আদির বন্ধন-সমন্বিত গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কূটধর্ম-পরায়ণ। এই কূটধর্ম বা ছলধর্মকে প্রহ্লাদ মহারাজ অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অন্ধকূপের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন কারণ অন্ধকূপে পতিত হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সে সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করতে পারে, কিন্তু কেউই তার সেই আর্তনাদ শুনতে পাবে না অথবা তাকে উদ্ধার করতে আসবে না।

ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ১৯/১৫১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—*ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।* সমস্ত জীবেরা বিভিন্ন লোকে নানা প্রকার শরীরে ভ্রমণ করছে। তাদের সেই উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণের সময়, তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় কোন ভক্তের সঙ্গলাভ করে, তা হলে তাদের জীবন সার্থক হয়। মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ যদিও সকাম কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তবুও দেবর্ষি নারদ তাঁর কাছে এসেছিলেন। মহারাজ ছিলেন পরম ভাগ্যবান, তাই তিনি নারদ মুনির সঙ্গলাভ করেছিলেন, যিনি তাঁকে দিব্য জ্ঞানের আলোক দান করেছিলেন। সাধুদের কর্তব্য হচ্ছে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করে, মোহাচ্ছন্ন মানুষদের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাদের কর্মবন্ধন থেকে উদ্ধার করা।

শ্লোক ৭

নারদ উবাচ

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে ।
সংজ্ঞাপিতাঞ্জীবসঙ্ঘান্নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ উত্তর দিলেন; **ভোঃ ভোঃ**—ওহে; **প্রজা-পতে**—হে প্রজাপালক; **রাজন্**—হে রাজন্; **পশূন্**—পশু; **পশ্য**—দেখুন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অধ্বরে**—যজ্ঞে; **সংজ্ঞাপিতান্**—নিহত; **জীব-সঙ্ঘান্**—পশুসমূহ; **নির্ঘৃণেন**—নির্দয়ভাবে; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে প্রজাপালক রাজন্! আপনি যজ্ঞস্থলে যে-সমস্ত পশুদের নির্দয়ভাবে বলি দিয়েছেন, গগনমার্গে সেই সমস্ত পশুদের দেখুন।

তাৎপর্য

যেহেতু বেদে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই প্রায় সমস্ত ধর্ম-অনুষ্ঠানে পশুবলি দেওয়া হয়। কিন্তু, কেবল শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পশুহত্যা করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের স্তর অতিক্রম করে, প্রকৃত সত্য—জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। নারদ মুনি রাজাকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাবনা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। জ্ঞান বিনা জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায় না, এবং জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত না হলে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায় না। কর্মীরা সাধারণত জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে ব্যস্ত, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যে-কোন পাপকর্ম করতে প্রস্তুত থাকে। পশুবলি এই রকম একটি পাপকর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। তাই নারদ মুনি তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত মৃত পশুদের দেখিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব ।
সম্পরেতম্ অয়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

এতে—তারা সকলে; **ত্বাম্**—আপনি; **সম্প্রতীক্ষন্তে**—প্রতীক্ষা করছে; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করছে; **বৈশসম্**—আঘাত; **তব**—আপনার; **সম্পরেতম্**—মৃত্যুর পর; **অয়ঃ**—লৌহনির্মিত; **কূটৈঃ**—শৃঙ্গ দ্বারা; **ছিন্দন্তি**—বিদীর্ণ করবে; **উত্থিত**—উদ্দীপ্ত; **মন্যবঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

আপনি যে তাদের পীড়ন করেছেন তা স্মরণ করে, এই সমস্ত পশুরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আপনার মৃত্যুর পর তারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে, লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে।

তাৎপর্য

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে যজ্ঞে পশুহত্যার পরিণাম সম্বন্ধে বোঝাতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশুদের তৎক্ষণাৎ মনুষ্য শরীর লাভ হয়। তেমনই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ন্যায্য কারণে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হলে, তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন। *মনু-সংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজার উচিত হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা, যার ফলে তাকে যেন আর পরবর্তী জীবনে তার অপরাধমূলক কার্যের জন্য দুঃখভোগ করতে না হয়। সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে নারদ মুনি রাজাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যজ্ঞে রাজা যে-সমস্ত পশুদের হত্যা করেছিলেন, তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। নারদ মুনি এখানে কোন পরস্পর-বিরোধী কথা বলেননি। তিনি রাজাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যজ্ঞে অত্যধিক পশুবধ অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে যদি কোন রকম নগণ্য ত্রুটিও হয়, তা হলে নিহত পশু মনুষ্য-জীবনে উন্নীত হতে পারে না। তার ফলে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীকে সেই পশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকতে হয়, ঠিক যেমন একজন হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির হত্যার জন্য দায়ী থাকে। কসাইখানায় যখন পশুবধ হয়, তখন ছয়জন মানুষ সেই জন্য দায়ী থাকে। যে ব্যক্তি সেই পশুবধের অনুমতি দেয়, যে ব্যক্তি হত্যা করে, যে ব্যক্তি সাহায্য করে, যে ব্যক্তি সেই পশুর মাংস ক্রয় করে, যে ব্যক্তি সেই পশুমাংস রন্ধন করে এবং যে ব্যক্তি তা আহার করে, সকলেই এই হত্যাকার্যে জড়িত থাকে। নারদ মুনি এই তত্ত্বের প্রতি রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে যজ্ঞেও পশু বধ করার নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অত্র তে কথয়িষ্যেঽমুমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম ॥ ৯ ॥

অত্র—এখানে; **তে**—আপনাকে; **কথয়িষ্যে**—আমি বলব; **অমুম্**—এই বিষয়ে; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **পুরঞ্জনস্য**—পুরঞ্জনের বিষয়ে; **চরিতম্**—তার চরিত্র; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **গদতঃ মম**—আমি যা বলছি।

অনুবাদ

এই সম্পর্কে আমি আপনাকে পুরঞ্জন নামক এক রাজার সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাব। আপনি দয়া করে সমাহিত চিত্তে তা শ্রবণ করার চেষ্টা করুন।

তাৎপর্য

মহর্ষি নারদ অন্য আর একটি বিষয় সম্বন্ধে—রাজা পুরঞ্জনের ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। সেটি ছিল ভিন্নভাবে বর্ণিত রাজা প্রাচীনবর্হিষতেরই ইতিহাস। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সেটি ছিল একটি রূপক। পুরঞ্জন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যে-ব্যক্তি তার দেহকে ভোগ করে।' পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের কাহিনী শুনতে চায়, তাই নারদ মুনি রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন। এই রাজা পুরঞ্জন হচ্ছেন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ স্বয়ং। নারদ মুনি সরাসরিভাবে যজ্ঞে যে পশু বলি দেওয়া হয়, তার নিন্দা করতে চাননি। বুদ্ধদেব কিন্তু সরাসরিভাবে সমস্ত পশুবলির পন্থা বর্জন করেছিলেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বলেছেন—*নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্ ।* *শ্রুতিজাতম্* বলতে বোঝায় যে, *বেদে* পশুবলি অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব পশুবলি বন্ধ করার জন্য সরাসরিভাবে *বেদকে* অস্বীকার করেছেন। তার ফলে বেদের অনুগামীরা বুদ্ধদেবকে স্বীকার করেন না। যেহেতু তিনি *বেদের* প্রামাণিকতা স্বীকার করেননি, তাই ভগবান বুদ্ধদেবকে নাস্তিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। দেবর্ষি নারদ কিন্তু *বেদের* প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে পারেন না, তাই তিনি মহারাজ প্রাচীন-বর্হিষৎকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কর্মকাণ্ডের পন্থা অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক।

মূর্খ মানুষেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অত্যন্ত কঠিন এই কর্মকাণ্ডের পথ অবলম্বন করে। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের বলা হয় মূঢ়। মূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে জীবনের চরম লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের সময় আমরা দেখি যে, মানুষেরা এই আন্দোলনের প্রতি খুব একটা আকৃষ্ট হয় না, কারণ তারা হচ্ছে সকাম কর্মে লিপ্ত মূঢ়দের দল। ।। হয়েছে যে—*উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।* মূর্খ

ব্যক্তিকে যদি সৎ উপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে সে সেই উপদেশের সদ্ব্যবহার করার পরিবর্তে, উপদেষ্টার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরোধী হয়। যেহেতু নারদ মুনি তা খুব ভালভাবে জানতেন, তাই তিনি রাজাকে তাঁর সারা জীবনের ইতিহাসের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। সোনা অথবা হীরের নথ বা দুল পরতে হলে, নাক অথবা কান ফুটো করতে হয়। কর্মকাণ্ডের মার্গে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য এইভাবে দুঃখ সহ্য করা হয়। কেউ যদি ভবিষ্যতে সুখভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে বর্তমানে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কেউ যদি ভবিষ্যতে কোটিপতি হয়ে তা উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে সেই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সেটিই হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয়। যারা সেই মার্গের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে নারদ মুনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সকাম কর্মে যুক্ত হতে হলে, কিভাবে কঠোর দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়। যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের বলা হয় *বিষয়ী। বিষয়ীর* অর্থ হচ্ছে বিষয়ের ভোক্তা, অর্থাৎ তারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের কার্যে লিপ্ত। নারদ মুনি পরোক্ষভাবে মহারাজ পুরঞ্জনের কাহিনীর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের পন্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং বিপজ্জনক।

ইতিহাসম্ ও *পুরাতনম্* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীব যদিও জড় দেহে বাস করে, এই জড় দেহে জীবের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*অনাদি করম-ফলে পড়ি' ভবার্ণব-জলে, তরিবারে না দেখি উপায়।* প্রতিটি জীবই এই জড় জগতে তার পূর্বকৃত কর্মফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে; তাই সকলেরই একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। মূর্খ জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের মনগড়া বিবর্তনবাদ সৃষ্টি করেছে, যা কেবল জড় শরীর সম্পর্কেই। কিন্তু তা প্রকৃত ক্রম-বিবর্তন নয়। প্রকৃত বিবর্তন হচ্ছে জীবের ইতিহাস, যাকে এখানে *পুরঞ্জন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ 'দেহরূপ পুরে যে বাস করে'। শ্রীনারদ মুনি এই বিবর্তনবাদ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপলব্ধির জন্য ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করবেন।

শ্লোক ১০

আসীৎপুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎসখাবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥ ১০ ॥

আসীৎ—ছিল; **পুরঞ্জনঃ**—পুরঞ্জন; **নাম**—নামক; **রাজা**—রাজা; **রাজন্**—হে রাজন্; **বৃহৎ-শ্রবাঃ**—যাঁর কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত মহৎ; **তস্য**—তার; **অবিজ্ঞাত**—অবিজ্ঞাত; **নামা**—নামক; **আসীৎ**—ছিল; **সখা**—বন্ধু; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **চেষ্টিতঃ**—যার কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে রাজন্! পুরাকালে পুরঞ্জন নামক এক রাজা ছিলেন, যিনি তাঁর মহান কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর অবিজ্ঞাত ('অজ্ঞাত') নামক এক বন্ধু ছিল। তাঁর কার্যকলাপ কেউ বুঝতে পারত না।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব হচ্ছে *পুরঞ্জন* । *পুরম্* মানে 'এই শরীরে' এবং *জন* মানে হচ্ছে 'জীব'। অতএব প্রতিটি জীবই হচ্ছে পুরঞ্জন। প্রতিটি জীবই তার দেহের রাজা, কারণ জীবকে তার ইচ্ছা অনুসারে, তার দেহটিকে ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে সাধারণত ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য তার শরীরটি ব্যবহার করে, কারণ যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন, তারা মনে করে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করা। সেটিই হচ্ছে কর্মকাণ্ডের পন্থা। যার আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই সে জানে না যে, প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী আত্মা। যারা কেবল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় মোহিত হয়ে রয়েছে, তাদের বলা হয় বিষয়ী। সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত মানুষেরা, যারা কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারেই আগ্রহী, তাদের পুরঞ্জন নামে সম্বোধন করা যেতে পারে। যেহেতু এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের খেয়াল-খুশিমতো তাদের ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে, তাই তাদের রাজাও বলা যেতে পারে। দায়িত্বহীন রাজারা তাদের রাজপদকে এবং রাজ্যকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে, তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য রাজকোষের অর্থ অপব্যয় করে।

বৃহচ্ছ্রবাঃ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রবঃ* মানে হচ্ছে 'খ্যাতি'। জীব প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা*—"জীবের কখনও জন্ম হয় না এবং মৃত্যুও হয় না।" যেহেতু সে নিত্য, তাই তার কার্যকলাপও নিত্য, যদিও সেগুলির অনুষ্ঠান হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শরীরে। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—"শরীরকে হত্যা করা হলেও, তার মৃত্যু হয় না।" এইভাবে জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে, নানা

প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে। প্রতিটি দেহেই জীব বহু রকম কর্ম করে। কখনও সে একজন মহান নায়ক হয়—ঠিক যেমন হিরণ্যকশিপু ও কংস অথবা আধুনিক যুগের নেপোলিয়ন কিংবা হিটলার। এই সমস্ত মানুষদের কার্যকলাপ অবশ্যই অত্যন্ত বিরাট, কিন্তু তাদের দেহটি বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যায়। তখন কেবল তাদের নামের মধ্যেই তারা থাকে। তাই জীবকে *বৃহচ্ছ্রবাঃ* বলা যেতে পারে; তার বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের জন্য তার বিপুল খ্যাতি থাকতে পারে। অবশ্য তার এক বন্ধু রয়েছে, যাঁকে সে জানে না। বিষয়াসক্ত মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। পরমাত্মা যদিও জীবাত্মার সখারূপে তার ঠিক পাশেই বসে রয়েছেন, তবু জীবাত্মা তা জানতে পারে না। তাই তাঁকে *অবিজ্ঞাত-সখা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *অবিজ্ঞাত-চেষ্টিতঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জীব পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কঠোর পরিশ্রম করে এবং প্রকৃতির নিয়মে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে এবং জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম থেকে মুক্ত বলে মনে করে। *ভগবদ্গীতায়* (২/২৪) বলা হয়েছে—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চঃ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

"জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য। সে নিত্য, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনশীল, অচল এবং সনাতন।"

জীব *সনাতন* অর্থাৎ নিত্য। যেহেতু কোন অস্ত্রের দ্বারা তাকে হত্যা করা যায় না, আগুনের দ্বারা ভস্মীভূত করা যায় না, জলের দ্বারা সিক্ত বা দ্রবীভূত করা যায় না, বায়ুর দ্বারা শুকানো যায় না, সে জড় প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত। যদিও সে দেহগুলি পরিবর্তন করছে, তবুও সে জাগতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাকে জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে স্থাপন করা হয়েছে, এবং সে তার সখা পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" এইভাবে ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং জীবের বাসনা অনুসারে জীবকে কর্ম করার নির্দেশ দেন। ভগবান যে তার সমস্ত বাসনা চরিতার্থ

করার সুযোগ দিচ্ছেন, সেই কথা জীব এই জীবনে এবং তার পূর্ববর্তী জীবনেও বুঝতে পারেনি। ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কারোরই কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। ভগবান যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করছেন, তা বদ্ধ জীবের অজ্ঞাত।

শ্লোক ১১

সোঽন্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ ।
নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎস বিমনা ইব ॥ ১১ ॥

সঃ—সেই রাজা পুরঞ্জন; **অন্বেষমাণঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **শরণম্**—আশ্রয়; **বভ্রাম**—ভ্রমণ করেছিলেন; **পৃথিবীম্**—সারা পৃথিবী; **প্রভুঃ**—স্বতন্ত্র ঈশ্বর হওয়ার জন্য; **ন**—কখনই না; **অনুরূপম্**—তার ইচ্ছানুরূপ; **যদা**—যখন; **অবিন্দৎ**—খুঁজে পেয়েছিলেন; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর বসবাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছানুরূপ কোন স্থান খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পুরঞ্জনের এই ভ্রমণ ঠিক আধুনিক যুগের হিপিদের মতো। সাধারণত হিপিরা হচ্ছে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনী পিতাদের সন্তান। এমন নয় যে, তারা সব সময় গরিব ছিল। কিন্তু তারা তাদের পিতাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করে সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীব প্রভু বা ঈশ্বর হতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব কখনই প্রভু নয়; সে হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। জীব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে প্রভু হতে চায়, তখন সে সারা জগৎ ভ্রমণ করতে থাকে। এই জগতে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনি এবং কোটি কোটি গ্রহলোক রয়েছে। জীব এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার শরীরে ও বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করতে থাকে, এবং তাই তার অবস্থা ঠিক রাজা পুরঞ্জনের মতো, যে তার বসবাসের উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন,—*কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড/অমৃত বলিয়া যেবা খায়, নানা যোনি সদা ফিরে*—"যে মানুষ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ বিষকে অমৃত মনে করে পান করে, সে নিরন্তর বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে।" *কদর্য ভক্ষণ করে*—"এবং, তার দেহ অনুসারে, সে নানা প্রকার কদর্য বস্তু আহার করে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যখন একটি শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে বিষ্ঠা আহার করে। জীব যখন একটি কাকের শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সব রকমের আবর্জনা খায়, এমন কি পুঁজ ও কফ খায়, এবং সেগুলিকে সে অত্যন্ত উপাদেয় বলে মনে করে। এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর দেখিয়েছেন যে, জীব বিভিন্ন শরীরে ভ্রমণ করে সব রকম কদর্য বস্তু ভক্ষণ করে। তা সত্ত্বেও সে যখন সুখী হতে পারে না, তখন সে বিষণ্ণ হয়ে হিপির জীবন অবলম্বন করে।

তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *ন অনুরূপম্*, অর্থাৎ রাজা তাঁর উপযুক্ত কোন স্থান খুঁজে পাননি। তার কারণ হচ্ছে এই জড় জগতে কোন গ্রহলোকে এবং কোন প্রকার দেহেই জীব সুখী হতে পারে না, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুই আত্মার অনুপযুক্ত। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, জীব স্বতন্ত্রভাবে প্রভু হতে চায়, কিন্তু যখন সে সেই ধারণা পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব বরণ করে, তৎক্ষণাৎ তার আনন্দময় জীবনের শুরু হয়। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে',
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ।

সেই সম্পর্কে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন! ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং সমস্ত জীবদের তিনি মায়ানির্মিত যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে ভ্রমণ করাচ্ছেন।"

বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার যোনিসম্ভূত দেহরূপ যন্ত্রে বাহিত হয়ে জীবেরা ভ্রমণ করছে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবদের জিজ্ঞাসা করছেন, কেন তারা এই সমস্ত দেহরূপ যন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, এই মায়ার তরঙ্গ অতিক্রম করার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন।

জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই, তিনি আমাদের উপদেশ দেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই জন্য কোন দুশ্চিন্তা করো না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

এইভাবে আমরা এক দেহ থেকে আর এক দেহে, এবং এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণরূপ সংসার বন্ধন থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)। ভ্রমণ করার সময় কোন জীব যদি যথেষ্ট ভাগ্যবান হন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন, এবং তখন তাঁর প্রকৃত জীবন শুরু হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত ভ্রাম্যমাণ জীবদের শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে সুখী হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

এই শ্লোকে *বিমনা ইব* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই জড় জগতে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। ব্রহ্মাও যদি উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হন, তা হলে যে-সমস্ত সাধারণ জীব এই গ্রহলোকে কার্য করছে, তাদের আর কি কথা? *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।

"এই জগতে সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কটি স্থানই দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ, যেখানে নিরন্তর জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়।" জড় জগতে জীব কখনই তৃপ্ত নয়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের পদ প্রাপ্ত হলেও জীব উৎকণ্ঠাতেই পূর্ণ থাকে, কারণ সে ভ্রান্তিবশত এই জড় জগৎকে সুখভোগের একটি স্থান বলে মনে করছে।

শ্লোক ১২

ন সাধু মেনে তাঃ সর্বা ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; **সাধু**—ভাল; **মেনে**—মনে করে; **তাঃ**—তাদের; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **ভূ-তলে**—এই পৃথিবীতে; **যাবতীঃ**—সর্বপ্রকার; **পুরঃ**—বাসগৃহ; **কামান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়; **কাময়মানঃ**—বাসনা করে; **অসৌ**—সেই রাজা; **তস্য**—তাঁর; **তস্য**—তাঁর; **উপপত্তয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জনের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অন্তহীন বাসনা ছিল; তার ফলে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এমন একটি স্থানের অন্বেষণ করছিলেন, যেখানে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন কোন স্থান খুঁজে পেলেন না।

তাৎপর্য

মহান বৈষ্ণব কবি শ্রীল বিদ্যাপতি গেয়েছেন—

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে ।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ইন্দ্রিয় সুখভোগকে এখানে মরুভূমিতে একবিন্দু জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মরুভূমির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সমুদ্রের প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে যদি এক বিন্দু জল ঢালা হয়, তাতে কি লাভ হয়? তেমনই, জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, *বেদান্ত-সূত্রে* যাদের *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* বা পূর্ণ আনন্দময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, জীবও পূর্ণ আনন্দের অন্বেষণ করছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কখনই সেই আনন্দ লাভ করা যায় না। বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে জীব কোন কোন শরীরে একটু-আধটু সুখ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সুখভোগ কোন জড় শরীরেই সম্ভব নয়। তাই পুরঞ্জন বা জীব বিভিন্ন প্রকার শরীরে ভ্রমণ করে কেবল সুখভোগের প্রচেষ্টায় সর্বত্র নিরাশ হয়েছিল। অর্থাৎ, জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত চিৎ-স্ফুলিঙ্গ কখনই জড়-জাগতিক জীবনের কোন পরিবেশেই পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে পারে না। ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মগ্ন হয়ে, হরিণ কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু তার পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু। তেমনই, মাছ তাদের জিহ্বার তৃপ্তিসাধনে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু সে যখন ধীবরের টোপ গেলে, তখন তার জীবনের অবসান হয়। এমন কি হাতিও, যে অত্যন্ত বলবান, হস্তিনীর সঙ্গে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লালসায় তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে, সে বন্দি হয়। প্রত্যেক যোনিতে জীব তার

ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করার জন্য শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তার ইন্দ্রিয়গুলি একসঙ্গে উপভোগ করতে পারে না। মনুষ্য-জীবনে সে তার সব কটি ইন্দ্রিয়কে বিকৃতভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায়, কিন্তু তার ফলে তাকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় যে, চরমে সে বিষণ্ণ হয়। সে যতই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, ততই সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১৩

স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু ।
দদর্শ নবভির্দ্বার্ভিঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—সেই রাজা পুরঞ্জন; **একদা**—এক সময়; **হিমবতঃ**—হিমালয় পর্বতের; **দক্ষিণেষু**—দক্ষিণে; **অথ**—তার পর; **সানুষু**—শিখরে; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **নবভিঃ**—নয়টি; **দ্বার্ভিঃ**—দ্বারযুক্ত; **পুরম্**—একটি নগর; **লক্ষিত**—গোচরীভূত; **লক্ষণাম্**—সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এক সময় হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ নামক স্থানে নয়টি দ্বার এবং সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত একটি নগরী দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ নামক স্থান। জীব যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে তখন বুঝতে হবে যে, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

অতএব যারা এই ভারতবর্ষে মনুষ্য-জন্ম লাভ করেন, তাঁরা জীবনের সমস্ত সুবিধা লাভ করেন। তাঁরা জড়-জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার উন্নতির জন্যই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জীবন সার্থক করতে পারেন। জীবনের উদ্দেশ্যসাধন

করে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করে পরোপকার করতে পারেন। অর্থাৎ, যাঁরা তাঁদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁদের জন্ম সার্থক করার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের পরিবেশ এমনই যে, জাগতিক অবস্থার দ্বারা বিচলিত না হয়ে, মানুষ এখানে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে মানুষেরা সব রকম দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। তখন অত্যধিক ঠাণ্ডা অথবা অত্যধিক গরম কোনটিই ছিল না। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ সেই সময় ছিল না। কিন্তু এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ কৃত্রিমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও এই দেশের সংস্কৃতি এমনই যে, মানুষ অনায়াসে জীবনের চরম লক্ষ্য—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। তাই বুঝতে হবে যে, পূর্বজন্মের বহু পুণ্যের ফলেই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।

এই শ্লোকে *লক্ষিত-লক্ষণাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত মঙ্গলজনক। বৈদিক সংস্কৃতি জ্ঞানে পূর্ণ, এবং ভারতবর্ষে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা বৈদিক জ্ঞান এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক সংস্কৃতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমান সময়েও, সারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করার সময় আমরা দেখি যে, অনেক দেশে মানুষদের জড়-জাগতিক সব রকম সুবিধা রয়েছে, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতির কোন সুযোগ নেই। সর্বত্রই একটি বিশেষ ত্রুটি আমরা দেখতে পাই যে, এক দিকের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব। অন্ধ চলতে পারে কিন্তু দেখতে পায় না, আর পঙ্গু দেখতে পারে কিন্তু চলতে পারে না। অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায় অনুসারে, যখন অন্ধ মানুষ পঙ্গুকে তার কাঁধে তুলে নেয়, তখন সেই পঙ্গুর পরিচালনায় অন্ধ ব্যক্তি চলতে সক্ষম হয়। তেমনই, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা এবং জাগতিক প্রয়োজনীয়তাগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জাগতিক সুখভোগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কারও কোন ধারণা নেই। অনেকে পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের আকাঙ্ক্ষী, কিন্তু প্রতারকেরা এসে তাদের প্রতারণা করে তাদের টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার হচ্ছে, যাতে জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার উন্নতি-সাধনের জন্যই সব রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ হতে পারে। এইভাবে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ভারতবর্ষের গ্রামের যে-কোন মানুষ শহরের কলকারখানার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে, জীবনের যে-কোন অবস্থায় থেকে পারমার্থিক উন্নতিসাধন করতে পারে। দেহকে বলা হয় নবদ্বার সমন্বিত নগরী, এবং সেই নয়টি দ্বার হচ্ছে—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, একটি মুখ, একটি উপস্থ ও একটি পায়ু। এই নয়টি দ্বার যখন পরিষ্কার থাকে এবং যথাযথভাবে ক্রিয়া করে, তখন দেহ সুস্থ থাকে। ভারতবর্ষের গ্রামের মানুষেরা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে, কুয়া বা নদীর জলে স্নান করে, মন্দিরে মঙ্গল-আরতিতে যোগদান করে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করে এই নয়টি দ্বারই পবিত্র রাখেন। এইভাবে মনুষ্য-জীবনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করা যায়। আমরা ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পদ্ধতি প্রচলিত করছি। যাঁরা সেই সুযোগ গ্রহণ করছেন, তাঁরা পারমার্থিক জীবনে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষকে পঙ্গুর সঙ্গে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে অন্ধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গত দুই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকদের অধীনে ছিল, এবং তাই তার প্রগতিরূপ পা দুটি ভেঙ্গে গেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জাগতিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্যের ফলে, মানুষের চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলির অন্ধ মানুষেরা এবং ভারতবর্ষের পঙ্গু মানুষেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যৌথভাবে কার্য করতে পারেন। তা হলে ভারতের পঙ্গু মানুষেরা পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় প্রকৃত প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন, আর পাশ্চাত্যের অন্ধ মানুষেরা ভারতের পঙ্গু মানুষদের সহায়তায় পরমতত্ত্ব দর্শন করতে পারবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানব-সমাজের উন্নতি-সাধনের জন্য পাশ্চাত্যের জড়-জাগতিক প্রগতি এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সমন্বয়-সাধন করা উচিত।

শ্লোক ১৪

প্রাকারোপবনাট্টালপরিখৈরক্ষতোরণৈঃ ।
স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্বতো গৃহৈঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাকার—প্রাচীর; **উপবন**—উদ্যান; **অট্টাল**—অট্টালিকা; **পরিখৈঃ**—পরিখা; **অক্ষ**—গবাক্ষ তোরণৈঃ —বহির্দ্বার দ্বারা; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **রৌপ্য**—রৌপ্য; **অয়সৈঃ**—লৌহনির্মিত, **শৃঙ্গৈঃ**—শিখরযুক্ত; **সঙ্কুলাম্**—পরিব্যাপ্ত; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **গৃহৈঃ**—গৃহসমূহ।

অনুবাদ

সেই নগরীটি প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ ও বহির্দ্বার দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার গৃহসমূহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত শিখরের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

তাৎপর্য

দেহ ত্বকরূপ প্রাচীরের দ্বারা সংরক্ষিত। দেহের রোমগুলি উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং নাক, মস্তক আদি দেহের উচ্চতর অঙ্গগুলিকে অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের নিম্নভাগ এবং বলি রেখাগুলিকে পরিখার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, চোখ দুটিকে গবাক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং চোখের পাতা বহির্দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিন প্রকার ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্যোতক। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহা যথাক্রমে—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণকে বোঝায়। দেহটিকে কখনও কখনও কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি ধাতুসমন্বিত একটি বস্তা বলে মনে করা হয়। *যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে। শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৮৪/১৩) বর্ণনা অনুসারে, যারা কফ, পিত্ত ও বায়ুর এই বস্তাটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তারা একটি গরু অথবা গাধার থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ১৫

নীলস্ফটিকবৈদূর্যমুক্তামরকতারুণৈঃ ।
কৃপ্তহর্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব ॥ ১৫ ॥

নীল—নীলা; **স্ফটিক**—স্ফটিক; **বৈদূর্য**—হীরা; **মুক্তা**—মুক্তা; **মরকত**—পান্না; **অরুণৈঃ**—প্রবালের দ্বারা; **কৃপ্ত**—সুসজ্জিত; **হর্ম্য-স্থলীম্**—সেই প্রাসাদের মেঝে; **দীপ্তাম্**—উজ্জ্বল; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্যমণ্ডিত; **ভোগবতীম্**—ভোগবতী নামক দিব্য নগরী; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই নগরীর প্রাসাদের গৃহতল নীলা, স্ফটিক, হীরা, মুক্তা, পান্না ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই নগরীর গৃহসমূহ এমনই দীপ্তিযুক্ত ছিল যে, তার সৌন্দর্যের তুলনা দিব্য নগরী ভোগবতীর সঙ্গে করা যেত।

তাৎপর্য

দেহরূপ নগরীর রাজধানী হচ্ছে হৃদয়। রাজ্যের রাজধানী যেমন উচ্চ অট্টালিকা ও দীপ্তিময় প্রাসাদে পূর্ণ থাকে, ঠিক তেমনই হৃদয় জড় সুখভোগের বিভিন্ন বাসনা এবং পরিকল্পনায় পূর্ণ। এই প্রকার পরিকল্পনাগুলিকে নীলা, প্রবাল, মুক্তা, পান্না আদি মূল্যবান রত্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হৃদয় হচ্ছে সব রকম জড় সুখভোগের পরিকল্পনার কেন্দ্র।

শ্লোক ১৬

সভাচত্বররথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ ।
চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

সভা—সভাগৃহ; **চত্বর**—চতুষ্পথ; **রথ্যাভিঃ**—রাজপথের দ্বারা; **আক্রীড়-আয়তন**—দ্যূতক্রীড়ার স্থান; **আপণৈঃ**—বিপণির দ্বারা; **চৈত্য**—বিশ্রামস্থল; **ধ্বজ-পতাকাভিঃ**—ধ্বজ ও পতাকার দ্বারা; **যুক্তাম্**—সুসজ্জিত; **বিদ্রুম**—বৃক্ষরহিত; **বেদিভিঃ**—বেদিসমূহের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই নগরী বহু সভাগৃহ, চতুষ্পথ, রাজপথ, ভোজনালয়, দ্যূতক্রীড়ার স্থান, বাজার, বিশ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা এবং সুন্দর উদ্যান-সমন্বিত ছিল।

তাৎপর্য

এইভাবে রাজধানীর বর্ণনা করা হয়েছে। রাজধানীতে বহু সভাগৃহ, রাজপথ, চত্বর, বীথি ও রাস্তা, দ্যূতক্রীড়ার স্থান, বাজার ও বিশ্রামস্থান থাকে, এবং সেগুলি ধ্বজ ও পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত থাকে। চত্বরের চারপাশে রেলিং থাকে এবং সেখানে গাছপালা থাকে না। দেহের হৃদয়কে সভাগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ জীব পরমাত্মা-সহ হৃদয়ে অবস্থান করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।* হৃদয় হচ্ছে সমস্ত স্মৃতি, বিস্মৃতি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। দেহের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের আকর্ষণীয় চত্বরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না —এই তিনটি নাড়িকে রাজপথের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যৌগিক পন্থায় সংযত করা হয় সুষুম্না নামক নাড়ির মাধ্যমে, তাই সেটিকে বলা

হয় মুক্তির পথ। দেহটি হচ্ছে বিশ্রামস্থল কারণ জীব যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে দেহের অভ্যন্তরে বিশ্রাম করে। হাতের তালু ও পায়ের পাতাকে ধ্বজ ও পতাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

পুর্যাস্তু বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে ।
নদদ্বিহঙ্গালিকুলকোলাহলজলাশয়ে ॥ ১৭ ॥

পুর্যাঃ—সেই নগরীর; **তু**—তখন; **বাহ্য-উপবনে**—বাইরের উদ্যানে; **দিব্য**—অত্যন্ত সুন্দর; **দ্রুম**—বৃক্ষরাজি; **লতা**—লতা; **আকুলে**—পূর্ণ; **নদৎ**—ধ্বনিত করে; **বিহঙ্গ**—পক্ষীকুল; **অলি**—ভ্রমর; **কুল**—সমূহ; **কোলাহল**—গুঞ্জন; **জল-আশয়ে**—সরোবরে।

অনুবাদ

সেই নগরীর বাইরে এক সুন্দর সরোবরের চারপাশে বেষ্টন করে বহু সুন্দর বৃক্ষ ও লতা ছিল। সেই সরোবরের চারপাশে পক্ষীকুল মধুর স্বরে সর্বক্ষণ কূজন করত এবং ভ্রমরেরা গুঞ্জন করত।

তাৎপর্য

যেহেতু দেহটি একটি মহানগরীর মতো, তাই সেখানে অবশ্যই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য সরোবর ও উদ্যানের বিবিধ আয়োজন ছিল। দেহের যে-সমস্ত অঙ্গগুলি যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এখানে পরোক্ষভাবে সেগুলির কথা বলা হয়েছে। শরীরে উপস্থ আছে বলে, জীব যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যৌন বেগের দ্বারা উত্তেজিত হয়। শৈশবে সুন্দরী রমণীর দর্শনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি থাকলেও, উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যৌন উত্তেজনা থাকে না। যৌন উত্তেজনার অনুকূল অবস্থাগুলিকে এখানে নির্জন উদ্যান বা সুন্দর বাগানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেউ যখন বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিকে দর্শন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বলা হয় যে, পুরুষ যদি নির্জন স্থানে কোন রমণীকে দেখে উত্তেজিত না হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ব্রহ্মচারী। কিন্তু এই প্রকার আচরণ এখন প্রায় অসম্ভব। যৌন উত্তেজনা এতই প্রবল যে, কেবল দর্শন, স্পর্শন অথবা সম্ভাষণের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ

করার ফলে, এমন কি কেবল তাদের কথা চিন্তা করার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসীদের স্ত্রীসঙ্গ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নির্জন স্থানে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নির্জন স্থানে স্ত্রীসম্ভাষণ করা উচিত নয়, এমন কি তিনি যদি কন্যা, ভগ্নী অথবা মাতাও হন। যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, কেউ যদি অত্যন্ত বিদ্বানও হন, তবুও তিনি এই প্রকার পরিস্থিতিতে উত্তেজিত হবেন। তা যদি হয়, তা হলে একজন যুবক কি করে নির্জন উদ্যানে সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে শান্ত ও সংযত থাকতে পারে?

শ্লোক ১৮

হিমনির্ঝরবিপ্রুষ্মৎকুসুমাকরবায়ুনা ।
চলৎপ্রবালবিটপনলিনীতটসম্পদি ॥ ১৮ ॥

হিম-নির্ঝর—তুষার আচ্ছাদিত পর্বতের জলপ্রপাত থেকে; **বিপ্রুট্-মৎ**—জলকণা বহন করে; **কুসুম-আকর**—বসন্ত; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **চলৎ**—আন্দোলিত হয়ে; **প্রবাল**—শাখা; **বিটপ**—বৃক্ষ; **নলিনী-তট**—পদ্মপূর্ণ সরোবরের তটে; **সম্পদি**—সমৃদ্ধ-সমন্বিত।

অনুবাদ

সরোবরের তটস্থিত বৃক্ষের শাখাগুলি বসন্ত বায়ুর দ্বারা বাহিত তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের ঝর্নার জল প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *হিম-নির্ঝর* শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ঝর্না রসের (সম্পর্কের) দ্যোতক। শরীরে বিভিন্ন প্রকার রস রয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রস হচ্ছে শৃঙ্গার রস বা *আদি-রস।* যখন এই *আদি-রস* বা যৌন বাসনা কামদেব দ্বারা প্রেরিত বসন্ত বায়ুর সংস্পর্শে আসে, তখন তা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, এই সবই হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্যোতক। বায়ু হচ্ছে স্পর্শ। ঝর্না হচ্ছে রস। বসন্ত বায়ু *(কুসুমাকর)* হচ্ছে গন্ধ। এই সমস্ত বিবিধ ভোগ জীবনকে অত্যন্ত আনন্দদায়ক করে তোলে, এবং তার ফলে আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি।

শ্লোক ১৯

নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ ।
আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ ॥ ১৯ ॥

নানা—বিভিন্ন; **অরণ্য**—বন; **মৃগ**—পশু; **ব্রাতৈঃ**—সমূহের দ্বারা; **অনাবাধে**—অহিংসার ব্যাপারে; **মুনি-ব্রতৈঃ**—ঋষিদের মতো; **আহূতম্**—যেন নিমন্ত্রিত হয়ে; **মন্যতে**—মনে করে; **পান্থঃ**—পথিক; **যত্র**—যেখানে; **কোকিল**—কোকিলের; **কূজিতৈঃ**—কুহুরবের দ্বারা।

অনুবাদ

এই প্রকার পরিবেশে বনের পশুরাও মুনিদের মতো হিংসাবিহীন এবং ঈর্ষাবিহীন হয়েছিল। তার ফলে পশুরা অন্য কাউকে আক্রমণ করত না। তদুপরি সমস্ত স্থান কোকিলের কুহুরবে মুখরিত ছিল। তার ফলে পথিকেরা মনে করতেন সেই পরিবেশ যেন তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে, এবং তাই তাঁরা সেই সুন্দর উদ্যানে বিশ্রাম করতেন।

তাৎপর্য

স্ত্রীপুত্র-সমন্বিত শান্তিপূর্ণ পরিবারকে সেই অরণ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সন্তানেরা হিংসাবিহীন পশুর মতো। কিন্তু কখনও কখনও স্ত্রী এবং পুত্রদের *স্বজনাখ্য-দস্যু* বা আত্মীয়স্বজন নামক দস্যু বলা হয়। কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ ধন সংগ্রহ করে, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রেরা সেই ধনসম্পদ বনের দস্যু-তস্করদের মতো লুণ্ঠন করে নেয়। তা সত্ত্বেও পরিবারে স্ত্রী-পুত্রজনিত এই প্রচণ্ড অশান্তিকে উদ্যানে কোকিলের কুহুরবের মতো মনে হয়। এই প্রকার পরিবেশের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে, মানুষ আনন্দময় পারিবারিক জীবন উপভোগ করার জন্য যে-কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে।

শ্লোক ২০

যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্ ।
ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ ॥ ২০ ॥

যদৃচ্ছয়া—সহসা, বিনা প্রয়োজনে; **আগতাম্**—উপস্থিত হয়েছিল; **তত্র**—সেখানে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **প্রমদা**—একজন রমণী; **উত্তমাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী;

ভৃত্যৈঃ—সেবকদের দ্বারা পরিবৃত; **দশভিঃ**—দশজন; **আয়ান্তীম্**—এগিয়ে এসে; **এক-এক**—তাদের প্রত্যেকে; **শত**—এক শত; **নায়কৈঃ**—নেতা।

অনুবাদ

সেই অতি সুন্দর উদ্যানে বিচরণ করতে করতে রাজা পুরঞ্জন সহসা এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন, যিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশটি ভৃত্য ছিল, এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শত-শত পত্নী ছিল।

তাৎপর্য

দেহকে ইতিমধ্যেই একটি সুন্দর উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যৌবনে কামভাব জাগরিত হয়, এবং বুদ্ধি মানুষের কল্পনা অনুসারে, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ করার জন্য উন্মুখ হয়। যৌবনে পুরুষ অথবা স্ত্রী উভয়েই তাদের বুদ্ধি অথবা কল্পনা অনুসারে বিপরীত লিঙ্গের অন্বেষণ করে। বুদ্ধি মনকে প্রভাবিত করে, এবং মন দশটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। পাঁচটি ইন্দ্রিয় জ্ঞান আহরণ করে, এবং অন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় সরাসরিভাবে কর্ম করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বহু বাসনা থাকে। সেটিই হচ্ছে দেহ এবং দেহে অবস্থান করে যে দেহী বা পুরঞ্জন তার স্থিতি।

শ্লোক ২১

পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্বতঃ ।
অন্বেষমাণামৃষভমপ্রৌঢ়াং কামরূপিণীম্ ॥ ২১ ॥

পঞ্চ—পাঁচ; **শীর্ষ**—মস্তক; **অহিনা**—সর্পের দ্বারা; **গুপ্তাম্**—রক্ষিত; **প্রতীহারেণ**—দেহরক্ষীর দ্বারা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অন্বেষমাণাম্**—অন্বেষণকারী; **ঋষভম্**—পতি; **অপ্রৌঢ়াম্**—অল্পবয়স্কা; **কাম-রূপিণীম্**—কামবাসনা চরিতার্থ করতে অত্যন্ত আকর্ষণীয়া।

অনুবাদ

সেই রমণী পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট একটি সর্পের দ্বারা চারদিক থেকে সুরক্ষিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী, এবং তাঁকে উপযুক্ত পতির অন্বেষণে অত্যন্ত উৎসুক বলে প্রতীত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

জীবের শরীরে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান নামক পাঁচটি বায়ু ক্রিয়া করে। এই পঞ্চ প্রাণবায়ুকে একটি সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ সর্প কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতে পারে। বায়ুর দ্বারা বাহিত প্রাণশক্তিকে *প্রতিহার* বা দেহরক্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণশক্তি ব্যতীত কেউ এক পলকের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণশক্তির অধীনে কার্য করে।

সেই রমণী, যিনি হচ্ছেন বুদ্ধির প্রতীক, তিনি একজন উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, চেতনা ব্যতীত বুদ্ধি ক্রিয়া করতে পারে না। সুন্দরী রমণী তখনই সার্থক হন, যখন তিনি উপযুক্ত পতির দ্বারা সুরক্ষিত হন। বুদ্ধি সর্বদা নবীন থাকা উচিত, তাই এখানে *অপ্রৌঢ়াম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। জড় সুখভোগ মানে হচ্ছে বুদ্ধির দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ উপভোগ করা।

শ্লোক ২২

সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাম্ ।
সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥

সু-নাসাম্—অত্যন্ত সুন্দর নাক; **সু-দতীম্**—অত্যন্ত সুন্দর দাঁত; **বালাম্**—যুবতী রমণী; **সু-কপোলাম্**—সুন্দর কপোল; **বর-আননাম্**—সুন্দর মুখ; **সম**—সমান; **বিন্যস্ত**—রচিত; **কর্ণাভ্যাম্**—কর্ণযুগল; **বিভ্রতীম্**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডল-শ্রিয়ম্**—সুন্দর কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

সেই রমণীর নাক, দাঁত ও কপোল অত্যন্ত সুন্দর। তার কর্ণযুগল তেমনই সুন্দরভাবে বিন্যস্ত এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত।

তাৎপর্য

বুদ্ধির শরীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়সমূহকে উপভোগ করে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাকে আচ্ছাদিত করে, যেমন গন্ধ, রূপ, শব্দ ইত্যাদি। *সুনাসাম্* শব্দটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ইঙ্গিত করে। তেমনই, মুখ হচ্ছে রস গ্রহণের ইন্দ্রিয়, কারণ চর্বণ করে ও জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করে বস্তুর স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। *সুকপোলাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে

স্বচ্ছ মস্তিষ্ককে, যা বস্তুকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বুদ্ধির দ্বারা বস্তুসমূহকে যথাযথভাবে ঠিক করা যায়। দুই কানের কুণ্ডল বুদ্ধিরই দ্বারা পরানো হয়েছে। এইভাবে এখানে জ্ঞানলাভ করার উপায়গুলিকে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৩

পিশঙ্গনীবীং সুশ্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্ ।
পদ্ভ্যাং ক্বণদ্ভ্যাং চলন্তীং নূপুরৈর্দেবতামিব ॥ ২৩ ॥

পিশঙ্গ—পীতবর্ণ; **নীবীম্**—বস্ত্র; **সু-শ্রোণীম্**—সুন্দর নিতম্ব; **শ্যামাম্**—শ্যামবর্ণ; **কনক**—স্বর্ণনির্মিত; **মেখলাম্**—কোমরবন্ধ; **পদ্ভ্যাম্**—পায়ের দ্বারা; **ক্বণদ্ভ্যাম্**—কিঙ্কিণী ধ্বনি; **চলন্তীম্**—বিচরণ করছিলেন; **নূপুরৈঃ**—নূপুরের দ্বারা; **দেবতাম্**—স্বর্গের দেবতা; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই রমণীর কটি ও শ্রোণীদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর পরণে পীতবর্ণ শাড়ি এবং তাঁর কটিদেশ স্বর্ণমেখলা বেষ্টিত ছিল। তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর নূপুর থেকে কিঙ্কিণীধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উন্নত নিতম্ব ও কুচযুগল সমন্বিতা সুন্দর বসনা এবং অলঙ্কারে বিভূষিতা রমণীকে দর্শন করে, মনে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

স্তনৌ ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ ।
বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীং ব্রীড়য়া গজগামিনীম্ ॥ ২৪ ॥

স্তনৌ—স্তনযুগল; **ব্যঞ্জিত**—ইঙ্গিত করে; **কৈশোরৌ**—নবযৌবন; **সমবৃত্তৌ**—সমবর্তুল; **নিরন্তরৌ**—ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত, পাশাপাশি; **বস্ত্র-অন্তেন**—শাড়ির আঁচলের দ্বারা; **নিগূহন্তীম্**—আচ্ছাদন করার চেষ্টা করে; **ব্রীড়য়া**—লজ্জাবশত; **গজ-গামিনীম্**—হস্তিনীর মতো সুন্দর গতিতে যিনি গমন করেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁর বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা তাঁর সমবর্তুল এবং ব্যবধান-রহিত স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন। সেই গজগামিনী লজ্জাবশত বার বার তাঁর স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন।

তাৎপর্য

স্তনযুগল রাগ ও দ্বেষের প্রতীক। রাগ ও দ্বেষের লক্ষণ *ভগবদ্গীতায়* (৩/৩৪) বর্ণিত হয়েছে—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

"জীব ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ অনুভব করে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা বশীভূত হওয়া মানুষের উচিত নয়। কারণ সেগুলি আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ।"

রাগ ও দ্বেষের এই প্রতিনিধিদ্বয় পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে অত্যন্ত প্রতিকূল। মানুষের পক্ষে যুবতী রমণীর স্তনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বর্ণনা করেছেন যে, রমণীর স্তন, বিশেষ করে যুবতী রমণীর স্তন রক্ত ও মাংসের সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব উন্নত স্তনের মোহময়ী আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। সেগুলি হচ্ছে পুরুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য মায়ার দূত। স্তন যেহেতু সমানভাবে আকর্ষণ করে, তাই তাদের *সমবৃত্তৌ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ মানুষের হৃদয়েও যৌন বাসনা থাকে। এই উত্তেজনা থেকে মুক্ত হতে হলে, যামুনাচার্যের মতো আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, যিনি বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্ন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি নিত্য নতুন আনন্দের উপলব্ধি-সমন্বিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছি, তখন থেকে যখনই আমার মনে নারীসঙ্গ সুখের কথা স্মরণ হয়, তখন ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃত হয়, এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে

আমি থুথু ফেলি।" কেউ যখন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, তখন আর তিনি রক্ত-মাংসের দুটি পিণ্ডস্বরূপ যুবতী রমণীর স্তনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ অনুভব করেন না। *নিরন্তরৌ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যদিও স্তন দুটি ভিন্ন স্থানে অবস্থিত কিন্তু তাদের ক্রিয়া একই। আমাদের রাগ ও দ্বেষের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১/৩৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা উভয়েই রজোগুণ থেকে উদ্ভূত (*কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ*)।

নিগৃহন্তীম্ ('ঢাকবার চেষ্টা করে') শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা হলে সেগুলি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা রূপান্তরিত করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কামের উপযোগ করা যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। কামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ কর্মী দিনরাত পরিশ্রম করে; তেমনই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য দিনরাত কাজ করতে পারেন। ঠিক যেমন কর্মীরা তাদের কাম-ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, ভক্তেরও সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। তেমনই, ভক্তদ্বেষী অসুরদের উপর প্রয়োগ করে, ক্রোধের উপযোগ করা যায়। হনুমানজী তাঁর ক্রোধ এইভাবে উপযোগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একজন মহান ভক্ত, এবং অভক্ত রাক্ষস রাবণের রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে, তিনি তাঁর ক্রোধের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে কাম শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্যবহার করা যায়, এবং ক্রোধ অসুরদের দণ্ডদান করার মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। এই দুটি যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করা হয়, তখন তারা তাদের জড়-জাগতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৫

তামাহ ললিতং বীরঃ সব্রীড়স্মিতশোভনাম্ ।
স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা ॥ ২৫ ॥

তাম্—তাকে; **আহ**—সম্বোধন করে বলেছিলেন; **ললিতম্**—অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বরে; **বীরঃ**—বীর; **সব্রীড়**—লজ্জাযুক্ত; **স্মিত**—স্মিত হেসে; **শোভনাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী; **স্নিগ্ধেন**—কাম-বাসনার দ্বারা; **অপাঙ্গ-পুঙ্খেন**—কটাক্ষরূপ বাণের দ্বারা; **স্পৃষ্টঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **প্রেম-উদ্ভ্রমৎ**—প্রেম উৎপাদনকারী; **ভ্রুবা**—ভ্রুযুগলের দ্বারা।

অনুবাদ

বীর পুরঞ্জন সেই অত্যন্ত সুন্দর রমণীর ভ্রূযুগল ও হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তিনি তখনই তাঁর কাম-বাসনারূপী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সেই রমণী লজ্জাভরে হেসেছিলেন, তখন পুরঞ্জনের কাছে তাঁকে সুন্দর মনে হয়েছিল, যিনি বীর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে সম্বোধন না করে পারলেন না।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই দুইভাবে বীর। সে যখন মায়ার শিকার হয়, তখন সে মহান নেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ইত্যাদিরূপে এই জড় জগতের একজন মহান বীর রূপে কার্য করে। এবং তার বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জড় সভ্যতার উন্নতি-সাধনে সহায়তা করে। ইন্দ্রিয়ের প্রভু হয়ে গোস্বামীরূপেও একজন বীর হওয়া যায়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ হচ্ছে ভ্রান্ত বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় সুখভোগ থেকে বিরত করাই হচ্ছে প্রকৃত বীরত্ব। কেউ এই জড় জগতে যত বড় বীরই হোন না কেন, তিনি রমণীর স্তন নামক রক্ত-মাংসের পিণ্ডের দ্বারা অচিরেই পরাস্ত হয়ে যান। জড় জগতের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন রোমদেশীয় বীর অ্যান্টোনি ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। তেমনই বাজি রাও নামক মহারাষ্ট্রের একজন মহাবীর এক সুন্দরী রমণীর শিকার হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পূর্বে রাজনীতিবিদেরা বিষকন্যা নামক সুন্দরী রমণীদের তাদের কার্যসাধনের জন্য ব্যবহার করতেন। এই সমস্ত সুন্দরীদের শরীরে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই বিষ প্রবিষ্ট করা হত, যার ফলে তারা এত বিষাক্ত হয়ে যেত যে, কোন পুরুষকে কেবল চুম্বন করার দ্বারা তারা তাকে হত্যা করতে পারত। এই বিষ-কন্যাদের ব্যবহার করা হত চুম্বন করার মাধ্যমে শত্রুদের হত্যা করতে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে বড় বড় বীরেরা রমণীদের দ্বারা পরাভূত হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, জীব স্বভাবতই একজন মহাবীর, কিন্তু সে তার নিজের দুর্বলতার জন্য জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জীব যখন কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, তৎক্ষণাৎ সে মায়ার শিকার হয়। জীবকে জোর করে এই

জড় জগতে পাঠানো হয় না। সে সুন্দরী রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে, স্বেচ্ছায় এখানে অধঃপতিত হয়। সে জড়া প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হবে, না একজন বীরের মতো সেই আকর্ষণকে প্রতিহত করবে, সেই স্বাধীনতা প্রতিটি জীবের রয়েছে। মূল প্রশ্ন হচ্ছে জীব মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে, কি হবে না। এই জড় জগতের বন্ধনে জোর করে আবদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যে-ব্যক্তি প্রকৃতির আকর্ষণ প্রতিরোধ করে স্থির থাকতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত বীর এবং তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। ইন্দ্রিয়ের প্রভু না হলে, কেউ গোস্বামী হতে পারে না। জীব এই জগতে এই দুটি স্থিতির যে-কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয় সে ইন্দ্রিয়ের দাস হতে পারে, অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রভু হতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে, এই জড় জগতের একজন মস্ত বড় বীর হওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভু হয়ে, গোস্বামীরূপে একজন আধ্যাত্মিক বীর হওয়া যায়।

শ্লোক ২৬

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কস্যাসীহ কুতঃ সতি ।
ইমামুপ পুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে ॥ ২৬ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কঞ্জ-পলাশ**—কমল-দলের মতো; **অক্ষি**—চক্ষু; **কস্য**—কার; **অসি**—তুমি হও; **ইহ**—এখানে; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **সতি**—হে সাধ্বী; **ইমাম্**—এই; **উপ**—নিকটে; **পুরীম্**—নগরী; **ভীরু**—হে ভয়ভীতা; **কিম্**—কি; **চিকীর্ষসি**—তুমি করতে চাইছ; **শংস**—দয়া করে বল; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে, কার কন্যা এবং কোথা থেকে তুমি এখানে এসেছ, তা দয়া করে আমাকে বল। তোমাকে দেখে মনে হয় যে, তুমি অতি সাধ্বী। কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি এখানে কি করার চেষ্টা করছ? দয়া করে তুমি আমাকে তা বল।

তাৎপর্য

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* । মনুষ্যদেহ পাওয়ার পর, নিজেকে ও নিজের বুদ্ধিকে অনেক প্রশ্ন করা উচিত। মনুষ্যেতর জীবনে বুদ্ধি আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। কুকুর, বিড়াল, বাঘ ইত্যাদি

পশুরা সর্বদাই আহারের জন্য কোন খাদ্য অথবা নিদ্রা যাওয়ার জন্য কোন স্থান পাওয়ার আশায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে আত্মরক্ষা ও মৈথুনের চেষ্টাতেই সব সময় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা লাভ করা যায়, যার ফলে প্রশ্ন করা যায় সে কে, কেন সে এই পৃথিবীতে এসেছে, তার কর্তব্য কি, পরম ঈশ্বর কে, জড় পদার্থ ও চেতন জীবের মধ্যে পার্থক্য কি, ইত্যাদি। কত রকমের প্রশ্ন রয়েছে, এবং যে-মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান, তাঁর কর্তব্য সব কিছুর আদি উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা—*অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।* প্রতিটি জীবেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি রয়েছে, কিন্তু মনুষ্য-জীবনে জীবের কর্তব্য হচ্ছে, তার চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মনুষ্যোচিত বুদ্ধি। বলা হয় যে, কেবল তার দেহচেতনাতেই মগ্ন থাকে যে-ব্যক্তি, সে মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও পশুতুল্য। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" পশুশরীরে জীব ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত থাকে। তাকে বলা হয় *অপোহনম্* বা বিস্মৃতি। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে চেতনা অত্যন্ত বিকশিত, এবং তার ফলে মানুষ ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পায়। মনুষ্য-জীবনে জীবের কর্তব্য হচ্ছে পুরঞ্জনের মতো প্রশ্ন করা—সে কে, সে কোথা থেকে এসেছে, তার কর্তব্য কি, তার উপস্থিতির কারণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নগুলি করার মাধ্যমে তার বুদ্ধির যথার্থ সদ্ব্যবহার করা। এগুলি হচ্ছে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে শুরু করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে একটি পশু ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ২৭

ক এতেঽনুপথা যে ত একাদশ মহাভটাঃ ।
এতা বা ললনাঃ সুভ্রু কোঽয়ং তেঽহিঃ পুরঃসরঃ ॥ ২৭ ॥

কে—কে; **এতে**—এই সমস্ত; **অনুপথাঃ**—অনুগামীগণ; **যে**—যারা; **তে**—তোমার; **একাদশ**—একাদশ; **মহা-ভটাঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী দেহরক্ষী; **এতাঃ**—এই সব; **বা**—ও; **ললনাঃ**—রমণী; **সু-ভ্রু**—হে সুন্দরনয়না; **কঃ**—কে; **অয়ম্**—এই; **তে**—তোমার; **অহিঃ**—সর্প; **পুরঃ**—সম্মুখে; **সরঃ**—গমন করছে।

অনুবাদ

হে কমল-নয়না! তোমার সঙ্গে এই যে এগারজন শক্তিশালী দেহরক্ষী রয়েছে, এরা কে? আর ঐ দশজন বিশিষ্ট সেবকেরা কে? যে-সমস্ত রমণীরা সেই দশজন সেবকের অনুগমন করছে, তারা কে? আর তোমার সম্মুখে গমন করছে যে সাপটি, সেটিই বা কে?

তাৎপর্য

মনের দশটি বলবান সেবক হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় মনের নির্দেশ অনুসারে ক্রিয়া করে। মন ও দশেন্দ্রিয় একত্রে মিলিত হয়ে হচ্ছে এগারজন বলবান দেহরক্ষী। ইন্দ্রিয়ের শত-শত বৃত্তিকে এখানে *ললনাঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মন বুদ্ধির অধীনে ক্রিয়া করে, এবং মনের অধীনে রয়েছে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়ের অধীনে রয়েছে অসংখ্য বাসনা। কিন্তু এরা সকলেই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে, যাকে এখানে একটি সর্পরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকে, মন সক্রিয় হয়, মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি থেকে বহু কামনা-বাসনার উদয় হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব, যাকে এখানে পুরঞ্জনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সে এই সমস্ত বিষয়ের ভারে বিহ্বল হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলি কেবল উদ্বেগেরই উৎস। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত, এবং যিনি সব কিছু তাঁকে নিবেদন করেছেন, তিনি এই প্রকার উদ্বেগ থেকে মুক্ত। তাই ভগবানের শরণাগত হয়ে এই সমস্ত অনিত্য বিষয়ের চিন্তা তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৮

ত্বং হ্রীর্ভবান্যস্যথ বাগ্রমা পতিং
বিচিন্বতী কিং মুনিবদ্রহো বনে ।
ত্বদঙ্ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং
ক্ব পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—তুমি; **হ্রীঃ**—লজ্জা; **ভবানী**—শিবের পত্নী; **অসি**—হও; **অথ**—অথবা; **বাক্**—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবী; **রমা**—লক্ষ্মীদেবী; **পতিম্**—পতি; **বিচিন্বতী**—খুঁজছ,

চিন্তা করছ; **কিম্**—তুমি কি; **মুনি-বৎ**—মুনির মতো; **রহঃ**—এই নির্জন স্থানে; **বনে**—বনে; **ত্বৎ-অঙ্ঘ্রি**—তোমার চরণ; **কাম**—বাসনা করে; **আপ্ত**—লাভ করেছে; **সমস্ত**—সমস্ত; **কামম্**—বাঞ্ছিত বস্তু; **ক্ব**—কোথায়; **পদ্ম-কোশঃ**—পদ্মফুল; **পতিতঃ**—পড়ে গেছে; **কর**—হাতের; **অগ্রাৎ**—অগ্রভাগ বা তালু থেকে।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! তুমি কি লক্ষ্মীদেবী, না শিবের পত্নী ভবানী, না ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী? যদিও তুমি অবশ্যই তাঁদের একজন, তবুও আমি দেখছি যে, তুমি এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছ। মুনির মতো সংযত হয়ে, তুমি কি তোমার পতির অন্বেষণ করছ? তোমার পতি যেই হোন না কেন, তুমি যে তাঁর প্রতি এত অনুগত, তার ফলে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হবেন। আমি মনে করি যে, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীদেবী, কিন্তু তোমার হাতে তো পদ্মফুল নেই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই পদ্মফুলটি কোথায় পড়ে গেল?

তাৎপর্য

সকলেই নিজেকে সবচাইতে বুদ্ধিমান বলে মনে করে। মানুষ কখনও সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভের জন্য শিবপত্নী উমার পূজায় তার বুদ্ধি নিয়োজিত করে। কখনও বা সে ব্রহ্মার মতো জ্ঞানবান হওয়ার আশায় সরস্বতীদেবীর পূজায় তার বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে। কখনও বা বিষ্ণুর মতো ঐশ্বর্যশালী হওয়ার বাসনায় লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে। এই শ্লোকে রাজা পুরঞ্জন বা মোহাচ্ছন্ন জীব সেই সমস্ত প্রশ্ন করেছে, এবং সে বুঝতে পারছে না যে, কিভাবে সে তার বুদ্ধিকে নিয়োজিত করবে। পরমেশ্বর ভগবানের সেবাতেই কেবল বুদ্ধিকে নিয়োগ করা উচিত। এইভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করার ফলে, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবী তার প্রতি অনুকূল হন। লক্ষ্মীদেবী কখনও তাঁর পতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে আলাদা থাকেন না। তার ফলে কেউ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তখন তিনি আপনা থেকেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করেন। কারও রাবণের মতো একা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা কখনই উচিত নয়, কারণ তিনি তাঁর পতিবিহীন হয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না। তাই তাঁর আর একটি নাম হচ্ছে চঞ্চলা। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে, সেই রমণীর সঙ্গে পুরঞ্জনের বাক্যালাপ আমাদের বুদ্ধির প্রতীক। তিনি কেবল সেই রমণীর লজ্জার প্রশংসাই করেননি, তাঁর সেই লজ্জার জন্য তিনি তাঁর

প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পতি হওয়ার বাসনা পোষণ করছিলেন এবং তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ পতির কথা চিন্তা করছেন কি না অথবা তিনি বিবাহিতা কি না। এটিই হচ্ছে ভোগ-ইচ্ছার একটি দৃষ্টান্ত। যে-ব্যক্তি এই প্রকার বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং যিনি আকৃষ্ট হন না, তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাজা পুরঞ্জন সেই রমণীর রূপের প্রশংসা করছিলেন, যেন তিনি ছিলেন লক্ষ্মীদেবী, অথচ সেই সঙ্গে তিনি এও জানতেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ছাড়া আর কেউই লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করতে পারেন না। যেহেতু তাঁর সন্দেহ হয়েছিল তিনি লক্ষ্মীদেবী কি না, তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর হাতে পদ্মফুল নেই কেন। জড় জগৎও লক্ষ্মীদেবী কারণ জড়া প্রকৃতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশনায় পরিচালিত হয়, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)।

জড় জগৎ কোন জীবের ভোগ্য নয়। কেউ যদি তা ভোগ করতে চায়, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ রাবণ, হিরণ্যকশিপু অথবা কংসের মতো অসুরে পরিণত হয়। রাবণ যেহেতু লক্ষ্মী সীতাদেবীকে ভোগ করতে চেয়েছিল, তাই সে সবংশে তার ধনসম্পদ-সহ বিনষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জীব বিষ্ণু প্রদত্ত মায়াকে ভোগ করতে পারে। নিজের ইন্দ্রিয় ও বাসনার তৃপ্তিসাধন মানে হচ্ছে মায়ার উপভোগ, লক্ষ্মী-দেবীকে নয়।

শ্লোক ২৯

নাসাং বরোর্বন্যতমা ভুবিস্পৃক্
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্ ।
অর্হস্যলঙ্কর্তুমদভ্রকর্মণা
লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা ॥ ২৯ ॥

ন—না; **আসাম্**—এই সবের; **বরোরু**—হে পরম সৌভাগ্যশালিনী; **অন্যতমা**—কেউ; **ভুবি-স্পৃক্**—ভূমি স্পর্শ করে; **পুরীম্**—নগরী; **ইমাম্**—এই; **বীর-বরেণ**—মহাবীর; **সাকম্**—সহ; **অর্হসি**—তুমি যোগ্য; **অলঙ্কর্তুম্**—অলঙ্কৃত করার জন্য; **অদভ্র**—মহিমান্বিত; **কর্মণা**—যার কার্যকলাপ; **লোকম্**—জগৎ; **পরম্**—দিব্য; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ইব**—সদৃশ; **যজ্ঞ-পুংসা**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তার সঙ্গে।

অনুবাদ

হে পরম সৌভাগ্যবতী! আমার মনে হচ্ছে যে, যাদের কথা আমি উল্লেখ করলাম তুমি তাঁদের কেউ নও, কারণ আমি দেখছি যে, তোমার পদযুগল ভূমিস্পর্শ করছে। কিন্তু তুমি যদি এই গ্রহলোকের কোন সুন্দরী হও, তা হলে লক্ষ্মীদেবী যেমন বিষ্ণুর সঙ্গে বিরাজ করে বৈকুণ্ঠলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমন তুমিও আমার সঙ্গে এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। তুমি জেনে রাখ যে, আমি হচ্ছি একজন মহান বীর এবং এই পৃথিবীর একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা।

তাৎপর্য

আসুরিক ও দৈবী মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দৈবী মনোভাবাপন্ন ভক্তরা খুব ভালভাবে জানেন যে, বিষ্ণু বা নারায়ণের নিত্য সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীকে জীব কখনও ভোগ করতে পারে না। এই অতি উন্নত স্তরের জ্ঞানকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই নারায়ণের সমৃদ্ধির অনুকরণ করে সুখী হতে চায়। এই শ্লোকে পুরঞ্জন উল্লেখ করেছেন যে, সেই রমণীকে একজন সাধারণ স্ত্রী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছেন যে, তাঁর সঙ্গিনী হয়ে তিনি লক্ষ্মীদেবীর মতো সুখী হতে পারেন। এইভাবে তিনি একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহান রাজারূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন এবং লক্ষ্মীদেবীর মতো সুখী হন। ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করে এই জগৎ ভোগ করার বাসনা হচ্ছে দৈব। কিন্তু অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার না করে, এই জড় জগৎ ভোগ করতে চায়। এটিই হচ্ছে দেবতা ও অসুরের মধ্যে পার্থক্য।

এই শ্লোকে *ভুবি-স্পৃক্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতারা যখন এই পৃথিবীতে আসেন, তখন তাঁরা এই পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করেন না। পুরঞ্জন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি স্বর্গলোক বা উচ্চতর লোকের অধিবাসী ছিলেন না, কারণ তাঁর চরণ ভূমি স্পর্শ করেছিল। যেহেতু এই পৃথিবীতে প্রতিটি স্ত্রীই অত্যন্ত প্রভাবশালী, ধনী ও পরাক্রমশালী পতি বাসনা করে, তাই পুরঞ্জন সেই রমণীকে প্রলুব্ধ করার জন্য নিজেকে তেমন একজন ব্যক্তি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এই জড় জগতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ভোগ করতে চায়। পুরুষ সুন্দরী নারীকে ভোগ করতে চায়, এবং নারী পরাক্রমশালী ও প্রভাবশালী পুরুষকে উপভোগ করতে চায়। এই প্রকার জড় বাসনা-সমন্বিত জীবকে বলা হয় পুরুষ বা ভোক্তা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, নারী ভোগ্যা এবং পুরুষ ভোক্তা, কিন্তু অন্তরে সকলেই ভোক্তা। তাই জড় জগতে সব কিছুকেই বলা হয় মায়া।

শ্লোক ৩০

যদেষ মাপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং
সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্ভ্রুবা ।
ত্বয়োপসৃষ্টো ভগবান্মনোভবঃ
প্রবাধতেঽথানুগৃহাণ শোভনে ॥ ৩০ ॥

যৎ—যেহেতু; **এষঃ**—এই; **মা**—আমাকে; **অপাঙ্গ**—তোমার কটাক্ষের দ্বারা; **বিখণ্ডিত**—বিক্ষুব্ধ; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয় অথবা মন; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **ভাব**—অনুরাগ; **স্মিত**—হাস্য; **বিভ্রমৎ**—মোহিত হচ্ছে; **ভ্রুবা**—ভ্রুসমন্বিত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উপসৃষ্টঃ**—প্রভাবিত হয়ে; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **মনঃ-ভবঃ**—কামদেব; **প্রবাধতে**—পীড়িত করছে; **অথ**—অতএব; **অনুগৃহাণ**—সদয় হও; **শোভনে**—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

তোমার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার চিত্তকে অত্যন্ত বিচলিত করছে। তোমার হাসি লজ্জাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কামোদ্দীপক হওয়ার ফলে, আমার অন্তরে পরম শক্তিশালী কামদেবকে জাগরিত করছে। তাই হে সুন্দরী! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সদয় হও।

তাৎপর্য

সকলেরই অন্তরে কামবাসনা রয়েছে, এবং সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগলের আন্দোলনের ফলে যখনই তা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন অন্তরে কামদেব তাঁর শর নিক্ষেপ করে হৃদয়কে বিদ্ধ করেন। এইভাবে মানুষ সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগলের দ্বারা অচিরেই পরাস্ত হন। কেউ যখন কাম-বাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি সর্বপ্রকার বিষয়ের দ্বারা (যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত আকর্ষণীয় বিষয়গুলি মানুষকে রমণীর বশীভূত হতে বাধ্য করে। এইভাবে জীবের বদ্ধ জীবন শুরু হয়। বদ্ধ জীবন মানে হচ্ছে স্ত্রীর বশীভূত হওয়া, এবং জীব নিশ্চিতরূপে সর্বদাই স্ত্রী অথবা পুরুষের কৃপার উপর নির্ভর করে। এইভাবে জীব পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং তার ফলে তারা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে বদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে।

শ্লোক ৩১

ত্বদাননং সুভ্রু সুতারলোচনং
ব্যালম্বিনীলালকবৃন্দসংবৃতম্ ।
উন্নীয় মে দর্শয় বল্গুবাচকং
যদ্‌ব্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিস্মিতে ॥ ৩১ ॥

ত্বৎ—তোমার; **আননম্**—মুখ; **সু-ভ্রু**—সুন্দর ভ্রুসমন্বিত; **সু-তার**—সুন্দর চোখের মণি; **লোচনম্**—নয়নযুগল; **ব্যালম্বি**—বিলম্বিত; **নীল**—নীলবর্ণ; **অলক-বৃন্দ**—কেশরাশি; **সংবৃতম্**—পরিবেষ্টন করে রয়েছে; **উন্নীয়**—উন্নত হয়ে; **মে**—আমাকে; **দর্শয়**—দেখাও; **বল্গু-বাচকম্**—অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বাক্যসমন্বিত; **যৎ**—যে মুখ; **ব্রীড়য়া**—লজ্জার দ্বারা; **ন**—না; **অভিমুখম্**—মুখোমুখি; **শুচি-স্মিতে**—হে সুহাসিনী।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! সুন্দর ভ্রু ও নয়ন-সমন্বিত তোমার মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং তাকে বেষ্টন করে রয়েছে তোমার শ্যামচিক্কণ কেশরাজি। তোমার মুখ থেকে অতি সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে। তুমি লজ্জাবশত আমার দিকে তাকাতে পারছ না। তাই আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, হে সুন্দরী! দয়া করে তুমি তোমার মস্তক উন্নত কর এবং মধুর হাস্য সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তাৎপর্য

কেউ যখন কোন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন সে ঠিক এইভাবে কথা বলে। একে বলা হয় জড়া প্রকৃতির বন্ধনজনিত মোহ। কেউ যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন সে তা ভোগ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়। তার বিস্তৃত বর্ণনা পুরঞ্জনের এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যে একজন সুন্দরীর দ্বারা মোহিত হয়েছিল। বদ্ধ জীবনে জীব মুখ, ভ্রূ, চোখ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সব কিছুই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কোন পুরুষ অথবা স্ত্রী যখন পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন সে সুন্দর কি অসুন্দর, সেই সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। প্রেমিক তার প্রেমিকার মুখের সব কিছু সুন্দর বলে দর্শন করে এবং তার ফলে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ হচ্ছে এই জড়-জাগতিক জীবের অধঃপতনের কারণ। তার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৭) বলা হয়েছে—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে অর্জুন! হে পরন্তপ! সমস্ত জীব ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, মোহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে।"

জীবনের এই বদ্ধ অবস্থাকে অবিদ্যা বলা হয়। অবিদ্যার বিপরীত হচ্ছে বিদ্যা। *শ্রীঈশোপনিষদে* বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। অবিদ্যা জীবের বন্ধনের কারণ এবং বিদ্যা জীবের মুক্তির কারণ। এখানে পুরঞ্জন স্বীকার করেছেন যে, তিনি অবিদ্যার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। এখন তিনি অবিদ্যার পূর্ণস্বরূপ দর্শন করতে চাইছেন এবং তাই তিনি সেই রমণীকে অনুরোধ করছেন, তিনি যেন তাঁর মস্তক উন্নত করেন, যাতে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করতে পারেন। এইভাবে তিনি অবিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গ দর্শন করতে চাইছেন, যা অবিদ্যাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

শ্লোক ৩২

নারদ উবাচ

ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ ।
অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীর মোহিতা ॥ ৩২ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **ইত্থম্**—তার পর; **পুরঞ্জনম্**—পুরঞ্জনকে; **নারী**—রমণী; **যাচমানম্**—প্রার্থনা করে; **অধীর-বৎ**—অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে; **অভ্যনন্দত**—তিনি সম্বোধন করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **বীরম্**—বীর; **হসন্তী**—হেসে; **বীর**—হে বীর; **মোহিতা**—তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্! পুরঞ্জন যখন সেই রমণীকে স্পর্শ করতে ও উপভোগ করতে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর বাক্যের দ্বারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মৃদু হেসে তাঁর সেই অনুরোধ স্বীকার করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনিও নিঃসন্দেহে রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কোন মানুষ যখন পূর্বপক্ষ অবলম্বন করে কোন স্ত্রীকে তার প্রেম নিবেদন করে, তখন স্ত্রীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই

প্রক্রিয়াকে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৮) *পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আকর্ষণ যৌন জীবনের স্তরে পর্যবসিত হয়। এইভাবে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে জড় বিষয়াসক্তির ভিত্তি। বদ্ধ জীবন অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রবৃত্তি হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের বিস্মৃতির কারণ। এইভাবে জীবের আদি কৃষ্ণচেতনা আচ্ছাদিত হয় অথবা জড় চেতনায় রূপান্তরিত হয়। তার ফলে মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগে মগ্ন হয়।

শ্লোক ৩৩

ন বিদাম বয়ং সম্যক্কর্তারং পুরুষর্ষভ ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

ন—করে না; **বিদাম**—জানা; **বয়ম্**—আমি; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **কর্তারম্**—কর্তা; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **আত্মনঃ**—আমার; **চ**—এবং; **পরস্য**—অন্যের; **অপি**—ও; **গোত্রম্**—বংশের ইতিহাস; **নাম**—নাম; **চ**—এবং; **যৎ-কৃতম্**—কোন্‌টি কার দ্বারা তৈরি হয়েছে।

অনুবাদ

সেই রমণী বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কে যে আমাকে উৎপন্ন করেছে তা আমি জানি না। আমি তোমাকে তা যথাযথভাবে বলতে পারব না। আমাদের সঙ্গীদের নাম এবং গোত্রও আমি জানি না।

তাৎপর্য

জীব তার উৎস সম্বন্ধে জানে না। সে জানে না এই জড় জগতের সৃষ্টি কেন হয়েছে, অন্যেরা কেন এই জড় জগতে কার্য করছে এবং এই জগতের চরম উৎস কি। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কেউই জানে না, এবং একে বলা হয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা। জীবনের উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করে বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা কিছু রাসায়নিক উপাদান কিংবা কোষের সমন্বয় দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে জীবনের আদি উৎস কি তা কেউই জানে না। *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* শব্দটি জড় জগতে আমাদের অস্তিত্বের আদি উৎস সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য সূচিত করে। কোন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনীতিবিদ্ প্রকৃতপক্ষে জানে না আমরা কোথা থেকে এসেছি, বেঁচে থাকার জন্য এখানে আমরা কেন এত কঠোর সংগ্রাম করছি, এবং আমরা কোথায় যাব। সাধারণত মানুষেরা মনে করে যে, ঘটনাক্রমে আমরা

এখানে এসেছি এবং যখন আমাদের শরীর নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা শূন্য হয়ে যাব। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা হচ্ছে নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদী। এই শ্লোকে রমণীটি জীবের প্রকৃত স্থিতি বর্ণনা করেছেন। তিনি পুরঞ্জনকে তাঁর পিতার নাম বলতে পারেননি, কারণ তিনি জানেন না কোথা থেকে তিনি এসেছেন। তিনি যে কেন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন তাও তিনি জানেন না। তিনি সরলভাবে বলেছেন যে, সেই সমস্ত বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। এই জড় জগতে জীবের এই হচ্ছে অবস্থা। বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও বড় বড় নেতা রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন, এবং তাঁরা এও জানেন না কেন তাঁরা এই জড় জগতে তথাকথিত সুখলাভের জন্য এত ব্যস্ত। এই জড় জগতে জীবন ধারণের জন্য আমাদের বহু সুন্দর সুন্দর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে, আমরা ভুলেও প্রশ্ন করি না, এই পৃথিবীতে আমাদের বসবাসের এত সুন্দর আয়োজন কে করেছেন। এখানে সব কিছুই একটি অতি সুন্দর নিয়ম মেনে চলছে, কিন্তু মূর্খের মতো মানুষেরা মনে করে যে, এই জড় জগতে সব কিছুই ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হয়েছে, এবং তাদের মৃত্যুর পর তারা শূন্যে লীন হয়ে যাবে। তারা মনে করে যে, বসবাসের এই সুন্দর স্থানটি আপনা থেকেই চিরকাল থাকবে।

শ্লোক ৩৪

ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরম্ ।
যেনেয়ং নির্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইহ—এখানে; **অদ্য**—আজ; **সন্তম্**—বিরাজ করছে; **আত্মানম্**—জীবাত্মা সমূহ; **বিদাম**—তা আমরা জানি; **ন**—না; **ততঃ পরম্**—তার অতীত; **যেন**—যার দ্বারা; **ইয়ম্**—এই; **নির্মিতা**—সৃষ্টি হয়েছে; **বীর**—হে মহাবীর; **পুরী**—নগরী; **শরণম্**—বিশ্রামস্থল; **আত্মনঃ**—সমস্ত জীবের।

অনুবাদ

হে মহাবীর! আমরা কেবল এটুকুই জানি যে, এই স্থানে আমরা রয়েছি। কিন্তু তার অতীত কোন কিছুই আমরা জানি না। আমরা এতই মূর্খ যে, আমাদের বসবাসের জন্য এই সুন্দর স্থানটি যে কে সৃষ্টি করেছেন, তাও আমরা জানতে চেষ্টা করি না।

তাৎপর্য

এই কৃষ্ণভাবনার অভাবকে বলা হয় অজ্ঞান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৫) বলা হয়েছে *পরাভবস্তাবদ্ অবোধ-জাতঃ ।* সকলেরই জন্ম হয়েছে অবিদ্যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* বর্ণনা করেছে যে, এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের অজ্ঞানের ফলে আমরা জাতীয়তাবাদ, পরোপকারবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি কত কিছুর সৃষ্টি করেছি। এই সবের মূলে রয়েছে অজ্ঞান। অতএব, অজ্ঞানপ্রসূত এই সমস্ত তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি-সাধনের কি মূল্য? যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসে, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ। এই মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞান দূর করা, কিন্তু কিভাবে সেই অজ্ঞান দূর করতে হয়, তা না জেনেই মানুষ কত কিছু পরিকল্পনা করছে এবং কত কিছু তৈরি করছে। কিন্তু মৃত্যুর পর, সেই সবই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ৩৫

এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্যশ্চ মানদ ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্তি নাগোঽয়ং পালয়ন্ পুরীম্ ॥ ৩৫ ॥

এতে—এই সমস্ত; **সখায়ঃ**—সখা; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **মে**—আমার; **নরাঃ**—মানুষ; **নার্যঃ**—নারী; **চ**—এবং; **মান-দ**—হে মাননীয়; **সুপ্তায়াম্**—নিদ্রিত অবস্থায়; **ময়ি**—আমি হই; **জাগর্তি**—জাগ্রত থাকে; **নাগঃ**—সর্প; **অয়ম্**—এই; **পালয়ন্**—রক্ষা করে; **পুরীম্**—এই নগরী।

অনুবাদ

হে মহাশয়! এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী, যারা আমার সঙ্গে রয়েছে, তারা আমার সখা ও সখী, এবং এই সর্পটি এই পুরীর রক্ষাকারী, এমন কি আমি নিদ্রিতা হলেও এই সর্পটি জাগরিত থাকে। আমি কেবল এটুকুই জানি। এর অধিক আর কিছুই আমি জানি না।

তাৎপর্য

পুরঞ্জন সেই রমণীকে এগারটি পুরুষ, তাদের পত্নী ও সর্পটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই রমণীটি সংক্ষেপে তাদের কথা বলেছিলেন। তাদের সম্বন্ধে

তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। যে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সর্পটি হচ্ছে জীবের প্রাণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি ক্লান্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনও প্রাণ জাগ্রত থাকে। অচেতন অবস্থায় যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখনও সর্পটি বা প্রাণশক্তি জাগ্রত থাকে। তার ফলে নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। জীব যখন এই জড় দেহ ত্যাগ করে, তখনও প্রাণশক্তি অক্ষত থাকে এবং তা অন্য আর একটি জড় শরীরে স্থানান্তরিত হয়। তাকে বলা হয় দেহান্তর, এবং মানুষ তাকে মৃত্যু বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে কারওই মৃত্যু হয় না। আত্মার সঙ্গে প্রাণশক্তি থাকে, আত্মা যখন তথাকথিত নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে, তখন সে তার এগারজন বন্ধুকে অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিবিধ বাসনা (পত্নীগণ) সহ দেখতে পায়। প্রাণশক্তি সব সময় থাকে। এমন কি যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকে এবং এই সর্পটি শরীরের ভিতর প্রবাহিত বায়ু ভক্ষণ করে জীবিত থাকে। শ্বাসক্রিয়া রূপে বায়ু প্রকট হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকে, ততক্ষণ আমরা বুঝতে পারি যে, সুপ্ত ব্যক্তিটি জীবিত রয়েছে। স্থূল শরীরটি নিদ্রিত থাকলেও প্রাণ সক্রিয় থাকে এবং দেহকে রক্ষা করে। এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্পটি দেহকে জীবিত রাখার জন্য বায়ু ভক্ষণ করে সক্রিয় থাকে।

শ্লোক ৩৬

দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে ।
উদ্বহিষ্যামি তাংস্তেঽহং স্ববন্ধুভিররিন্দম ॥ ৩৬ ॥

দিষ্ট্যা—আমার সৌভাগ্যক্রমে; **আগতঃ অসি**—তুমি এখানে এসেছ; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **তে**—তোমার; **গ্রাম্যান্**—বিষয় ভোগের; **কামান্**—কাম্য বস্তুসমূহ; **অভিপ্সসে**—যা তুমি উপভোগ করতে চাও; **উদ্বহিষ্যামি**—আমি সরবরাহ করব; **তান্**—সেই সমস্ত; **তে**—তোমাকে; **অহম্**—আমি; **স্ব-বন্ধুভিঃ**—আমার বন্ধুগণ-সহ; **অরিম্-দম**—হে শত্রু-সংহারক।

অনুবাদ

হে শত্রু-সংহারক! তুমি যে এখানে এসেছ, তা অবশ্যই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সর্বতোভাবে তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত অভিলাষ আমি এবং আমার বন্ধুরা সর্বতোভাবে পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

জীব এই জড় জগতে আসে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য, এবং এই রমণীটি যার প্রতীক, সেই বুদ্ধি তাকে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য পরিচালিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি আসে পরমাত্মা থেকে, এবং তিনি জীবকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

"যাঁরা পরমার্থ সাধনের পথে রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ থাকেন, তাঁদের লক্ষ্য কেবল একটিই। কিন্তু হে কুরুনন্দন! যারা সেই পথে দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ নয়, তাদের বুদ্ধি বহুশাখায় বিভক্ত।"

ভক্ত যখন আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হন, তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য থাকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। জড়-জাগতিক এমন কি আধ্যাত্মিক অন্য কোন বিষয়েও তাঁর কোন উৎসাহ থাকে না। রাজা পুরঞ্জন সাধারণ জীবের প্রতীক, এবং সেই রমণীটি সাধারণ জীবের বুদ্ধির প্রতীক। এই দুই একসাথে মিলে, জীব তার জড় ইন্দ্রিয়গুলি উপভোগ করে, এবং বুদ্ধি তার সেই উপভোগের সমস্ত সামগ্রীগুলি সরবরাহ করে। জীব যখনই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে বংশ, জাতি, আচার-অনুষ্ঠান, ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেগুলি সরবরাহ করে ভগবানের মায়া। এইভাবে জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য তার বুদ্ধিকে যথাসাধ্য ব্যবহার করে।

শ্লোক ৩৭

ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব পুরীং নবমুখীং বিভো ।
ময়োপনীতান্ গৃহ্ণানঃ কামভোগান্ শতং সমাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইমাম্—এই; **ত্বম্**—তুমি; **অধিতিষ্ঠস্ব**—এখানে থাক; **পুরীম্**—নগরীতে; **নব-মুখীম্**—নবদ্বার-সমন্বিত; **বিভো**—হে প্রভো; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপনীতান্**—আয়োজিত; **গৃহ্ণানঃ**—গ্রহণ করে; **কাম-ভোগান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রী; **শতম্**—একশ; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

হে প্রভু! তুমি যাতে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন করতে পার, সেই জন্যই আমি নবদ্বার সমন্বিত এই নগরীর আয়োজন করেছি। এখানে তুমি একশ বছর

বাস করতে পার, এবং তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য সব কিছু সরবরাহ করা হবে।

তাৎপর্য

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষানাং দারাঃ সম্প্রাপ্তি-হেতবঃ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সর্বপ্রকার সাফল্যের কারণ হচ্ছে পত্নী। কেউ যখন পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ করছেন। জীবনের প্রারম্ভে মানুষকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তার পর উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করে গৃহস্থ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কেউ যদি যথাযথভাবে গৃহস্থ-আশ্রমের শিক্ষালাভ করেন, তা হলে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তিনি প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুসারে আচরণ করলে, সব কিছুই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৮

কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্ ।
অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্ ॥ ৩৮ ॥

কম্—কাকে; **নু**—তা হলে; **ত্বৎ**—তুমি ছাড়া; **অন্যম্**—অন্য; **রময়ে**—আমি ভোগ করতে দেব; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অরতি-জ্ঞম্**—সম্ভোগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ; **অকোবিদম্**—অতএব প্রায় মূর্খ; **অসম্পরায়**—পরবর্তী জীবনের জ্ঞানরহিত; **অভিমুখম্**—অভিমুখী; **অশ্বস্তন-বিদম্**—পরে কি হবে তা যে জানে না; **পশুম্**—পশুতুল্য।

অনুবাদ

তুমি ছাড়া আর অন্য কোন্ পুরুষের সঙ্গে আমি বিহার করতে পারি? কারণ তাদের তো রতিজ্ঞান নেই এবং তারা জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর কিভাবে জীবন উপভোগ করতে হয় তা জানে না। এই প্রকার ব্যক্তিরা পশুতুল্য।

তাৎপর্য

যেহেতু ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন প্রকার যোনি রয়েছে, তাই জীবনের বহু পরিস্থিতিও রয়েছে। নিম্নস্তরের জীবনে (বৃক্ষলতার জীবনে) মৈথুনের সম্ভাবনা থাকে না। উচ্চতর জীবনে (পক্ষী ও পতঙ্গের জীবনে) তাদের মৈথুনের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু

মৈথুন সুখ যে কিভাবে উপভোগ করতে হয়, তা তারা জানে না। মনুষ্য-জীবনে অবশ্য মৈথুন সুখ উপভোগ করার পূর্ণজ্ঞান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত বহু দার্শনিক রয়েছে, যারা মৈথুনসুখ কিভাবে উপভোগ করতে হয় তার উপদেশ দেয়। *কামশাস্ত্র* নামক রতিকলার একটি বিজ্ঞানও রয়েছে। মনুষ্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম-বিভাগও রয়েছে। গার্হস্থ্য জীবন ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমে যৌন জীবন অনুমোদন করা হয়নি। ব্রহ্মচারী-আশ্রমে যৌন জীবন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, বানপ্রস্থী স্বেচ্ছায় যৌন জীবন থেকে বিরত থাকেন এবং সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে তাতে বিরক্ত। কর্মীরা ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম অনুশীলন করে না, কারণ তারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যধিক রুচিসম্পন্ন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষেরা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবই জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত। তারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আগ্রহী কারণ সেই জীবনে মৈথুন অনুমোদন করা হয়েছে। কর্মীরা মনে করে যে, অন্য আশ্রমগুলি পশু জীবনের থেকেও নিকৃষ্ট কারণ পশুরাও মৈথুনসুখ উপভোগ করে, কিন্তু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের যৌন জীবন সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হয়। তাই কর্মীরা আধ্যাত্মিক জীবনের এই সমস্ত আশ্রমগুলিকে ঘৃণা করে।

শ্লোক ৩৯

ধর্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ ।
লোকা বিশোকা বিরজা যান্ ন কেবলিনো বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম অনুষ্ঠান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অত্র**—এখানে (এই গৃহস্থ-আশ্রমে); **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কামৌ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; **চ**—এবং; **প্রজা-আনন্দঃ**—সন্তান উৎপাদনের সুখ; **অমৃতম্**—যজ্ঞের ফল; **যশঃ**—যশ; **লোকাঃ**—ভুবন; **বিশোকাঃ**—শোকরহিত; **বিরজাঃ**—রোগরহিত; **যান্**—যা; **ন**—কখনই না; **কেবলিনঃ**—পরমার্থবাদী; **বিদুঃ**—জানেন।

অনুবাদ

সেই রমণী বললেন—এই জগতে গৃহস্থ-জীবনেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের সর্বপ্রকার সুখভোগ করা যায়। তার পর মানুষ মুক্তি অথবা যশও প্রাপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থরা যজ্ঞের ফলও ভোগ করতে পারেন, যার ফলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ লোকে উন্নীত হতে পারেন। এই সমস্ত সুখভোগ

পরমার্থবাদীদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। তাঁরা এই প্রকার সুখের কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে মানুষের কর্মের দুটি মার্গ রয়েছে। একটিকে বলা হয় প্রবৃত্তি-মার্গ এবং অন্যটিকে বলা হয় নিবৃত্তি-মার্গ। এই দুটি মার্গেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় জীবন। পশুজীবনে কেবল প্রবৃত্তি-মার্গই রয়েছে। প্রবৃত্তি-মার্গের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগ, এবং নিবৃত্তি-মার্গের অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতিসাধন। পশু ও অসুরদের জীবনে নিবৃত্তি-মার্গের কোন ধারণাই নেই, এমন কি প্রবৃত্তি-মার্গের ধারণাও তাদের নেই। প্রবৃত্তি-মার্গে বলা হয়েছে যে, যদিও মানুষের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু সেই প্রবণতা চরিতার্থ করতে হবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে। যেমন, সকলেরই মৈথুনের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু আসুরিক সভ্যতায় কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতই সেই সুখ উপভোগ করার চেষ্টা করা হয়। বৈদিক সভ্যতায় বৈদিক নির্দেশের মাধ্যমে যৌন সুখ উপভোগ করা হয়। এইভাবে *বেদ* সভ্য মানুষদের নির্দেশ দেয়, কিভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রবণতা চরিতার্থ করতে হয়।

নিবৃত্তি-মার্গে কিন্তু মৈথুন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সমাজকে চারটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তাদের মধ্যে কেবল গার্হস্থ্য জীবনেই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে প্রবৃত্তির মার্গ অনুসরণ করা যায়। ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে যৌন জীবনের কোন অবকাশ নেই।

এই শ্লোকে রমণীটি কেবল প্রবৃত্তি-মার্গের প্রশংসা করে নিবৃত্তি-মার্গের নিন্দা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *যতি* বা পরমার্থবাদীরা, যারা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের *(কৈবল্য)* বিষয়েই উদ্যোগী, তাঁরা প্রবৃত্তি-মার্গের সুখের কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাঁরা এই জীবনে সুখভোগ করেন, এবং পরবর্তী জীবনেও স্বর্গলোকে উন্নীত হন। এই জীবনে তিনি নানা রকম ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকার ফলে, সন্তান-সন্ততি আদি নানা রকম জড় ঐশ্বর্য ভোগ করেন। জড়-জাগতিক ক্লেশ হচ্ছে—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। কিন্তু যাঁরা প্রবৃত্তি-মার্গে আগ্রহী, তাঁরা জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সময় নানা প্রকার ধার্মিক কৃত্য অনুষ্ঠান করেন। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কোন রকম পরোয়া না করে, তাঁরা নানা প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠানে মগ্ন থাকেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি-মার্গের ভিত্তি হচ্ছে যৌন জীবন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৫) বলা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধি-সুখং হি তুচ্ছম্।* যে গৃহস্থ প্রবৃত্তি-

মার্গে অত্যন্ত অনুরক্ত, তাকে গৃহস্থ বলা হয় না, তাকে বলা হয় গৃহমেধী। যদিও গৃহস্থ ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেন, তবুও তিনি বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন। কিন্তু গৃহমেধীরা কেবল ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিষয়েই আগ্রহী, তারা কোন রকম বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না। গৃহমেধী যৌন জীবনের মহিমা কীর্তন করে তার পুত্র-কন্যাদেরও যৌন জীবনে অনুপ্রাণিত করে এবং জীবনের অন্তিম সময়ে সর্বপ্রকার যশ থেকে বঞ্চিত হয়। গৃহস্থ এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনেও যৌন জীবন উপভোগ করে, কিন্তু গৃহমেধী জানে না তার পরবর্তী জীবনে কি গতি হবে, কারণ সে কেবল এই জীবনেই যৌন সুখ উপভোগে মগ্ন থাকে। মোট কথা হচ্ছে, কেউ যখন যৌন জীবনের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়, তখন সে পারমার্থিক জীবনের কোন রকম চেষ্টা করে না। বিশেষ করে এই কলিযুগে কেউই পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। যদিও কখনও কখনও দেখা যায়, কেউ কেউ পারমার্থিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভণ্ডদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিপথগামী হয়।

শ্লোক ৪০

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ ।
ক্ষেম্যং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্ গৃহাশ্রমঃ ॥ ৪০ ॥

পিতৃ—পিতৃগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **ঋষি**—ঋষিগণ; **মর্ত্যানাম্**—সাধারণ মানুষদের; **ভূতানাম্**—অসংখ্য জীবদের; **আত্মনঃ**—নিজের; **চ**—ও; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **ক্ষেম্যম্**—লাভপ্রদ; **বদন্তি**—লোকে বলে; **শরণম্**—আশ্রয়; **ভবে**—জড় জগতে; **অস্মিন্**—এই; **যৎ**—যা; **গৃহ-আশ্রমঃ**—গৃহস্থ-জীবন।

অনুবাদ

সেই রমণী বললেন—মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে, গৃহস্থ-জীবন কেবল নিজের জন্যই আনন্দদায়ক নয়, তা পিতৃগণ, দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, মহাত্মাগণ এবং অন্য সকলের জন্য প্রেয়স্কর। এইভাবে গৃহস্থ-আশ্রম সকলের জন্যই লাভজনক।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, কেউ যখন এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তার বহু ঋণ থাকে। সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের কাছে তার ঋণ থাকে, কারণ তাঁরা জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি সরবরাহ করছেন। দেবতাদের কৃপায়

আমরা তাপ, আলোক, জল এবং অন্যান্য আবশ্যক বস্তুগুলি প্রাপ্ত হই। আমরা পিতৃগণের কাছেও ঋণী, কারণ তাঁরা আমাদের এই শরীর, বুদ্ধি, সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেম প্রদান করেছেন। তেমনই আমরা রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণের কাছে ঋণী, এবং আমরা গরু, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি নিম্নস্তরের পশুদের কাছেও ঋণী। এইভাবে মনুষ্যরূপে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করা মাত্রই জীবের বহু ঋণ থাকে এবং সেই সমস্ত ঋণ শোধ করার দায়িত্বও থাকে। সে যদি সেই ঋণগুলি শোধ না করে, তা হলে তাকে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। জড় বিষয়ের প্রতি অত্যধিক আসক্ত গৃহমেধীরা কিন্তু জানে না যে, তারা যদি কেবল মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত গৃহমেধীদের কৃষ্ণভক্তিতে কোন রকম আসক্তি নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ । (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০)

গৃহব্রত মানে হচ্ছে *গৃহমেধী* । যারা যৌন জীবনকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে, তাদের কাছে কৃষ্ণভক্তি বিভ্রান্তিজনক বলে মনে হয়। নিজের ব্যক্তিগত বিবেচনার ফলেই হোক অথবা অন্যদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে কিংবা আলোচনা করেই হোক, সে যৌন জীবনের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে আর কৃষ্ণভক্তি করতে পারে না।

শ্লোক ৪১

কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনম্ ।
ন বৃণীত প্রিয়ং প্রাপ্তং মাদৃশী ত্বাদৃশং পতিম্ ॥ ৪১ ॥

কা—কে; **নাম**—যথার্থই; **বীর**—হে বীর; **বিখ্যাতম্**—প্রসিদ্ধ; **বদান্যম্**—উদার; **প্রিয়-দর্শনম্**—সুন্দর; **ন**—না; **বৃণীত**—গ্রহণ করবে; **প্রিয়ম্**—সহজেই; **প্রাপ্তম্**—লব্ধ; **মাদৃশী**—আমার মতো; **ত্বাদৃশম্**—আপনার মতো; **পতিম্**—পতিকে।

অনুবাদ

হে বীর! তুমি বিখ্যাত, উদার চিত্ত এবং অতি সুন্দর পুরুষ। অতএব তোমার মতো পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে, আমার মতো কামিনী আর কাকেই বা পতিত্বে বরণ করবে?

তাৎপর্য

প্রত্যেক পতিই তার পত্নীর কাছে এক মহাবীর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কোন স্ত্রী যখন কোন পুরুষকে ভালবাসে, তখন তার কাছে সেই পুরুষ অত্যন্ত সুন্দর ও উদার বলে মনে হয়। সুন্দর বলে মনে না হলে, নিজেকে তার কাছে সারা জীবনের জন্য উৎসর্গ করা যায় না। পতিকে অত্যন্ত উদার বলে মনে হয়, কারণ তিনি পত্নীকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সন্তান প্রদান করেন। প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে বাচ্চারা অত্যন্ত প্রিয়; তাই যে পতি যৌন জীবনের দ্বারা এবং সন্তান প্রদান করার দ্বারা তাঁর পত্নীর প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন, তাঁকে অত্যন্ত উদার বলে মনে করা হয়। পতি কেবল সন্তান উৎপাদন করেই উদার হন না, উপরন্তু অলঙ্কার, উপাদেয় খাদ্য ও বসন ইত্যাদি প্রদান করার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশে রাখেন। এই প্রকার সন্তুষ্ট পত্নী কখনই তাঁর পতির সঙ্গ ত্যাগ করবে না। *মনু-সংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পতির কর্তব্য হচ্ছে তাকে অলঙ্কার প্রদান করা, কারণ স্ত্রীলোকেরা সাধারণত গৃহ, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, সন্তান, ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এইভাবে স্ত্রীই সমস্ত জড় সুখের কেন্দ্রবিন্দু।

এই প্রসঙ্গে *বিখ্যাতম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুরুষদের সুন্দরী রমণীর পিছু লাগার প্রবণতা রয়েছে এবং কখনও কখনও তাকে ধর্ষণ বলে মনে করা হয়। ধর্ষণ যদিও বৈধ নয়, তবুও স্ত্রীলোকেরা ধর্ষণে অত্যন্ত দক্ষ পুরুষদের পছন্দ করে।

শ্লোক ৪২

কস্যা মনস্তে ভুবি ভোগিভোগয়োঃ
স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়োর্মহাভুজ ।
যোঽনাথবর্গাধিমলং ঘৃণোদ্ধত-
স্মিতাবলোকেন চরত্যপোহিতুম্ ॥ ৪২ ॥

কস্যাঃ—কার; **মনঃ**—মন; **তে**—তোমার; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **ভোগি-ভোগয়োঃ**—সর্পসদৃশ শরীর; **স্ত্রীয়াঃ**—নারীর; **ন**—না; **সজ্জেৎ**—আকৃষ্ট হয়; **ভুজয়োঃ**—বাহুর দ্বারা; **মহা-ভুজ**—হে মহাবীর; **যঃ**—যে; **অনাথ-বর্গা**—আমার মতো দুঃস্থ স্ত্রীলোকদের; **অধিম্**—মনঃ কষ্ট; **অলম্**—সক্ষম; **ঘৃণা-উদ্ধত**—উদ্ধত কৃপার দ্বারা; **স্মিত-অবলোকেন**—আকর্ষণীয় হাসির দ্বারা; **চরতি**—বিচরণ করে; **অপোহিতুম্**—দূর করার জন্য।

অনুবাদ

হে মহাবাহো! পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যার মন তোমার সর্পদেহ-সদৃশ বাহুযুগলের আলিঙ্গনের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তুমি তোমার মধুর হাস্য ও উদ্ধত কৃপার দ্বারা আমার মতো অনাথা মহিলাদের সমস্ত সন্তাপ দূর কর। আমরা মনে করি যে, তুমি কেবল আমাদের উপকারের জন্য এই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছ।

তাৎপর্য

কোন পতিহীনা স্ত্রী যখন কোন উদ্ধত পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে তা কৃপা বলে মনে করে। নারী সাধারণত পুরুষের দীর্ঘবাহুর দ্বারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। সাপের দেহ গোল এবং লেজের দিকে তা ক্রমশ সরু হয়ে আসে। পুরুষের সুন্দর বাহু স্ত্রীর কাছে ঠিক একটি সাপের শরীরের মতো মনে হয়, এবং সে সেই বাহুর আলিঙ্গন গভীরভাবে কামনা করে।

এই শ্লোকে *অনাথ-বর্গা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *নাথ* মানে হচ্ছে 'পতি', এবং অ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিহীন'। পতিবিহীন যুবতী নারীকে *অনাথ* বলা হয়, অর্থাৎ 'যে সংরক্ষিত নয়'। কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই, মেয়েরা যৌন বাসনার দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। তাই পিতার কর্তব্য হচ্ছে কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া। তা না হলে পতি না থাকার ফলে, সে গভীর মনঃপীড়া অনুভব করবে। সেই বয়সে যে তার যৌন বাসনা তৃপ্ত করে, সে তার পরম প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে দেখা গেছে যে, কৈশোর অবস্থায় কোন মেয়ের যৌন আবেদন যেই পুরুষ তৃপ্ত করে, সে যেই হোক না কেন, মেয়েটি আজীবন তাকে ভালবাসে। এইভাবে এই জড় জগতে তথাকথিত প্রেম কামের পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ৪৩

নারদ উবাচ

ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ ।
তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্মুমুদাতে শতং সমাঃ ॥ ৪৩ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তৌ**—তারা; **দম্পতী**—পতি ও পত্নী; **তত্র**—সেখানে; **সমুদ্য**—সমভাবে উৎসাহী হয়ে; **সময়ম্**—পরস্পরকে

স্বীকার করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **তাম্**—সেই স্থানে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **পুরীম্**—সেই নগরীতে; **রাজন্**—হে রাজন্; **মুমুদাতে**—তারা জীবন উপভোগ করেছিল; **শতম্**—এক শত; **সমাঃ**—বৎসর।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! সেই পুরুষ ও নারী পারস্পরিক সৌহার্দ্যের দ্বারা পরস্পরকে অঙ্গীকার করে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একশ বছর ধরে জীবন উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে একশ বছর তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রত্যেক মানুষের একশ বছর বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন গ্রহলোকে বিভিন্ন প্রকার আয়ু রয়েছে। অর্থাৎ, এই গ্রহের একশ বছর অন্য গ্রহের একশ বছর থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মলোকের গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর, কিন্তু ব্রহ্মার একদিন এই লোকের কোটি-কোটি বছরের সমান। তেমনই, স্বর্গলোকের একদিন এই গ্রহের ছয় মাসের সমান। কিন্তু প্রতিটি লোকে মানুষের আয়ু প্রায় একশ বছর। বিভিন্ন লোকে সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু অনুসারে, সেখানকার জীবনের মানও ভিন্ন।

শ্লোক ৪৪

উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ ।
ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্হ্রদিনীমাবিশচ্ছুচৌ ॥ ৪৪ ॥

উপগীয়মানঃ—সংস্তুত হয়ে; **ললিতম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **চ**—ও; **গায়কৈঃ**—গায়কদের দ্বারা; **ক্রীড়ন্**—খেলা করে; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের দ্বারা; **হ্রদিনীম্**—সরোবরে, **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **শুচৌ**—যখন খুব গরম হত।

অনুবাদ

গায়কেরা মনোহর সঙ্গীতে মহারাজ পুরঞ্জনের মহিমান্বিত কার্যকলাপের যশোগান করত। গ্রীষ্মকালে যখন অত্যন্ত গরম পড়ত, তখন তিনি কামিনীকুল পরিবৃত হয়ে সরোবরে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন।

তাৎপর্য

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় জীব ভিন্ন ভিন্ন কার্য করে। সেগুলি হচ্ছে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তি হচ্ছে অচেতন অবস্থা, এবং মৃত্যুর পর আর একটি অবস্থা রয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকে জাগ্রত অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ করে একশ বছর জীবন উপভোগ করে। এই শ্লোকে স্বপ্নাবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ পুরঞ্জন দিনের বেলায় যে কার্য করে, রাত্রে স্বপ্নাবস্থায়ও তা প্রতিফলিত হয়। পুরঞ্জন ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য তার পত্নীর সঙ্গে বাস করত, এবং রাত্রে বিভিন্নভাবে সেই ইন্দ্রিয়-সুখের স্বপ্ন দেখত। মানুষ যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, এবং কোন ধনীব্যক্তি যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়, তখন সে রমণীকুল পরিবৃত হয়ে তার বাগান-বাড়িতে গিয়ে জলক্রীড়া করে তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করে। এই সংসারে জীবের প্রবৃত্তিই এই রকম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষালাভ না করলে জীব কখনও স্ত্রীসঙ্গ করে তৃপ্ত হতে পারে না। সাধারণত মানুষ বহু স্ত্রীলোককে উপভোগ করতে চায়, এবং জীবনের অন্তিম সময়েও যৌন আবেদন এতই প্রবল থাকে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যুবতীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে চায়। এইভাবে তীব্র যৌন বাসনার ফলে, জীব এই জড় জগতের বন্ধনে অত্যন্ত প্রবলভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৪৫

সপ্তোপরি কৃতা দ্বারঃ পুরস্তস্যাস্তু দ্বে অধঃ ।
পৃথগ্বিষয়গত্যর্থং তস্যাং যঃ কশ্চনেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥

সপ্ত—সাত; **উপরি**—উপরে; **কৃতাঃ**—নির্মিত; **দ্বারঃ**—দ্বার; **পুরঃ**—নগরীর; **তস্যাঃ**—সেই; **তু**—তখন; **দ্বে**—দুই; **অধঃ**—নিম্নে; **পৃথক্**—ভিন্ন ভিন্ন; **বিষয়**—স্থানে; **গতি-অর্থম্**—যাওয়ার জন্য; **তস্যাম্**—সেই নগরীতে; **যঃ**—যিনি; **কশ্চন**—যে-কেউ; **ঈশ্বরঃ**—রাজ্যপাল।

অনুবাদ

সেই নগরীর নয়টি দ্বারের মধ্যে সাতটি দ্বার উপরিভাগে, এবং দুটি দ্বার অধোভাগে রয়েছে। এই দ্বারগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছে, এবং সেই দ্বারগুলি ব্যবহার করেন সেই নগরীর অধীশ্বর।

তাৎপর্য

উপরিভাগে অবস্থিত সাতটি দ্বার হচ্ছে—দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কর্ণ ও একটি মুখ। অধোভাগের দুটি দ্বার হচ্ছে—পায়ু ও উপস্থ। রাজা বা সেই দেহের অধীশ্বর জীবাত্মা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখ উপভোগ করার জন্য এই সমস্ত দ্বারগুলি ব্যবহার করে। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরীগুলিতে বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন দ্বারের প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। পূর্বে রাজধানীর চারপার্শ্বে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত, এবং বিভিন্ন নগরীতে অথবা বিভিন্ন দিকে যেতে হলে, ভিন্ন দ্বারের মধ্য দিয়ে যেতে হত। পুরানো দিল্লীতে এখনও নগরীকে বেষ্টন করে ছিল যে প্রাচীর তার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, এবং কাশ্মীরী গেট, লাহোরী গেট ইত্যাদি বিভিন্ন দ্বার রয়েছে। তেমনই আমেদাবাদেও দিল্লী গেট রয়েছে। এই উপমার প্রধান বিষয় হচ্ছে জীব বিভিন্ন প্রকার জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চায়, এবং সেই জন্য প্রকৃতি তার শরীরে বিভিন্ন রন্ধ্র দান করেছে, যাতে সে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য সেগুলির ব্যবহার করতে পারে।

শ্লোক ৪৬

পঞ্চ দ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা ।
পশ্চিমে দ্বে অমূষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে ॥ ৪৬ ॥

পঞ্চ—পাঁচ; **দ্বারঃ**—দ্বার; **তু**—কিন্তু; **পৌরস্ত্যাঃ**—পূর্বমুখী; **দক্ষিণা**—দক্ষিণমুখী; **একা**—এক; **তথা**—ও; **উত্তরা**—উত্তর দিকে একটি; **পশ্চিমে**—তেমনই, পশ্চিম দিকে; **দ্বে**—দুটি; **অমূষাম্**—তাদের; **তে**—আপনাকে; **নামানি**—নামগুলি; **নৃপ**—হে রাজন্; **বর্ণয়ে**—আমি বর্ণনা করব।

অনুবাদ

হে রাজন্! সেই নয়টি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি দ্বার পূর্বমুখী, একটি উত্তরমুখী, একটি দক্ষিণমুখী এবং দুটি পশ্চিমমুখী। আমি সেই সমস্ত দ্বারগুলির নাম আপনার কাছে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র এবং একটি মুখ, উপরিভাগের এই সাতটি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি সম্মুখভাগে রয়েছে, এবং সেগুলিকে পূর্বমুখী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু সম্মুখভাগে দর্শন করার অর্থ হচ্ছে সূর্যের দিকে মুখ করা, তাই সেগুলিকে

পূর্বমুখী দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণের দুটি দ্বার হচ্ছে দুটি কর্ণ, এবং পশ্চিমমুখী দুটি দ্বার হচ্ছে পায়ু ও উপস্থ। এই সমস্ত দ্বারগুলির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

খদ্যোতাবির্মুখী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্মিতে ।
বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ ॥ ৪৭ ॥

খদ্যোতা—খদ্যোতা নামক; **আবির্মুখী**—আবির্মুখী নামক; **চ**—ও; **প্রাক্**—পূর্বদিকস্থ; **দ্বারৌ**—দুটি দ্বার; **একত্র**—একস্থানে; **নির্মিতে**—নির্মিত হয়েছিল; **বিভ্রাজিতম্**—বিভ্রাজিত নামক; **জন-পদম্**—নগরী; **যাতি**—যেত; **তাভ্যাম্**—তাদের দ্বারা; **দ্যুমৎ**—দ্যুমান্ নামক; **সখঃ**—বন্ধুর সঙ্গে।

অনুবাদ

খদ্যোতা ও আবির্মুখী নামক দুটি দ্বার পূর্বদিকে স্থিত ছিল, কিন্তু তারা একস্থানেই নির্মিত ছিল। এই দুটি দ্বার দিয়ে রাজা তাঁর বন্ধু দ্যুমানের সঙ্গে বিভ্রাজিত নামক নগরীতে যেতেন।

তাৎপর্য

খদ্যোতা এবং আবির্মুখী নাম দুটির অর্থ যথাক্রমে 'জোনাকি' ও 'মশাল'। তা ইঙ্গিত করে যে, দুটি চোখের মধ্যে বাম চোখটির দর্শনের ক্ষমতা কম। যদিও দুটি চোখ একই স্থানে নির্মিত হয়েছে, তবুও একটি দর্শন-ক্ষমতা অন্যটির থেকে অধিক। রাজা বা জীব যথাযথভাবে বস্তুসমূহ দর্শন করার জন্য এই দুটি দ্বার ব্যবহার করেন। কিন্তু দ্যুমান্ নামক তাঁর বন্ধু যদি তাঁর সঙ্গে না থাকেন, তা হলে তিনি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন না। এই বন্ধুটি হচ্ছেন সূর্য। দুটি চক্ষু যদিও একস্থানে অবস্থিত, তবুও সূর্যকিরণ ব্যতীত তাদের দর্শন করার ক্ষমতা নেই। *বিভ্রাজিতং জনপদম্।* কেউ যদি স্পষ্টভাবে (*বিভ্রাজিতম্*) কোন কিছু দর্শন করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই দুটি চক্ষু এবং তার বন্ধু সূর্য-কিরণের সহায়তায় তা দর্শন করতে হয়। প্রতিটি ব্যক্তিই তার শরীরের রাজা, কারণ সে তার ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন দ্বার ব্যবহার করে। যদিও মানুষ তার দেখার অথবা শোনার ক্ষমতার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, তবুও সে প্রকৃতির সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৪৮

নলিনী নালিনী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্মিতে ।
অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্ ॥ ৪৮ ॥

নলিনী—নলিনী নামক; **নালিনী**—নালিনী নামক; **চ**—ও; **প্রাক্**—পূর্বদিক; **দ্বারৌ**—দুটি দ্বার; **একত্র**—একস্থানে; **নির্মিতে**—নির্মিত হয়েছে; **অবধূত**—অবধূত নামক; **সখঃ**—তাঁর বন্ধুর সঙ্গে; **তাভ্যাম্**—সেই দুটি দ্বারের মাধ্যমে; **বিষয়ম্**—স্থান; **যাতি**—যেতেন; **সৌরভম্**—সৌরভ নামক।

অনুবাদ

তেমনই পূর্বদিকে নলিনী ও নালিনী নামক আরও দুটি দ্বার রয়েছে, এবং তারাও একস্থানে নির্মিত হয়েছে। এই দ্বার দুটি দিয়ে রাজা অবধূত নামক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সৌরভ নামক নগরীতে গমন করতেন।

তাৎপর্য

নলিনী এবং নালিনী নামক দ্বার হচ্ছে দুটি নাসারন্ধ্র। জীব এই দুটি দ্বার ব্যবহার করেন বিভিন্ন অবধূত বা বায়ুর সহযোগিতায়, যা হচ্ছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া। এই দুটি দ্বার দিয়ে জীব সৌরভ নামক নগরীতে গমন করেন। অর্থাৎ, নাসিকা তার সখা বায়ুর সহযোগিতায়, এই জড় জগতে বিভিন্ন সৌরভ উপভোগ করে। নলিনী ও নালিনী হচ্ছে নাসিকার নালী, যার মাধ্যমে জীব নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং সৌরভ গ্রহণের আনন্দ আস্বাদন করে।

শ্লোক ৪৯

মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্ দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ ।
বিষয়ৌ যাতি পুররাড্রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥

মুখ্যা—মুখ্যা; **নাম**—নামক; **পুরস্তাৎ**—পূর্বদিকে; **দ্বাঃ**—দ্বার; **তয়া**—তার দ্বারা; **আপণ**—আপণ নামক; **বহূদনৌ**—বহূদন নামক; **বিষয়ৌ**—দুটি স্থান; **যাতি**—যেতেন; **পুররাট্**—সেই নগরীর রাজা (পুরঞ্জন); **রস-জ্ঞ**—রসজ্ঞ নামক; **বিপণ**—বিপণ নামক; **অন্বিতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

পূর্বদিকে অবস্থিত পঞ্চম দ্বারটির নাম মুখ্যা, অর্থাৎ প্রধান। এই দ্বার দিয়ে তিনি রসজ্ঞ ও বিপণ নামক তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বহূদন ও আপণ নামক দুটি স্থানে গমন করতেন।

তাৎপর্য

এখানে মুখকে মুখ্যা বা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মুখ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বার, কারণ মুখের দ্বারা দুটি কার্য সম্পন্ন হয়। প্রথমটি হচ্ছে আহার এবং অন্যটি হচ্ছে বাণী। আহার কার্য সম্পাদিত হয় রসজ্ঞ বা জিহ্বারূপ বন্ধুর দ্বারা, যা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। কথা বলার জন্য জিহ্বার ব্যবহার হয়, এবং সে হয় জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয় অথবা বৈদিক জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলতে পারে। এখানে অবশ্য জড় ইন্দ্রিয়-সুখের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই *রসজ্ঞ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্লোক ৫০

পিতৃহূর্নৃপ পুর্যা দ্বার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ ।
রাষ্ট্রং দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥

পিতৃহূঃ—পিতৃহূ নামক; **নৃপ**—হে রাজন্; **পুর্যাঃ**—নগরীর; **দ্বাঃ**—দ্বার; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **রাষ্ট্রম্**—দেশ; **দক্ষিণ**—দক্ষিণ দিকের; **পঞ্চালম্**—পঞ্চাল নামক; **যাতি**—গমন করতেন; **শ্রুত-ধর-অন্বিতঃ**—শ্রুতধর নামক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে।

অনুবাদ

সেই নগরীর দক্ষিণ দিকের দ্বারটির নাম পিতৃহূ, এবং সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তার বন্ধু শ্রুতধরের সঙ্গে দক্ষিণ-পঞ্চাল নামক নগরীতে গমন করতেন।

তাৎপর্য

দক্ষিণ কর্ণের ব্যবহার হয় কর্মকাণ্ডীয় বা সকাম কর্মের জন্য। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখ উপভোগে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে তার দক্ষিণ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করে এবং পিতৃ আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে। তাই এখানে দক্ষিণ কর্ণকে পিতৃহূদ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

দেবহূর্নাম পুর্যা দ্বা উত্তরেণ পুরঞ্জনঃ ।
রাষ্ট্রমুত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫১ ॥

দেবহূঃ—দেবহূ; **নাম**—নামক; **পুর্যাঃ**—নগরীর; **দ্বাঃ**—দ্বার; **উত্তরেণ**—উত্তর দিকে; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **রাষ্ট্রম্**—রাষ্ট্র; **উত্তর**—উত্তর দিক; **পঞ্চালম্**—পঞ্চাল নামক; **যাতি**—যেতেন; **শ্রুত-ধর-অন্বিতঃ**—তাঁর বন্ধু শ্রুতধরের সঙ্গে।

অনুবাদ

উত্তর দিকে ছিল দেবহূ নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা শ্রুতধরের সঙ্গে উত্তর-পঞ্চাল নামক স্থানে গমন করতেন।

তাৎপর্য

দুটি কান দেহের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকের কানটি অত্যন্ত প্রবল এবং তা সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। উত্তর দিকের দ্বারটি কিন্তু ব্যবহার করা হয় চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করার জন্য। দক্ষিণ দিকস্থ দক্ষিণ কর্ণটিকে বলা হয় পিতৃহূ, যা ইঙ্গিত করে যে, তা পিতৃলোক নামক উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দেবহূ নামক বাম কর্ণটির ব্যবহার হয় তার থেকেও উচ্চতর লোক, যথা—মহর্লোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক—এমন কি তার থেকেও উচ্চতর চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার জন্য, যেখানে জীব নিত্যকালের জন্য অবস্থান করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবদেবীদের পূজা করে, তারা সেই দেবদেবীদের লোকে জন্মগ্রহণ করবে; যারা ভূত-প্রেতদের পূজা করে, তারা তাদের লোকে জন্মগ্রহণ করবে। যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে গমন করবে; আর যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমার লোক প্রাপ্ত হয়ে আমার সঙ্গে বাস করবে।"

যারা এই গ্রহলোকে সুখী হতে চায় এবং মৃত্যুর পরেও সুখভোগ করতে আগ্রহান্বিত, তারা সাধারণত পিতৃলোকে উন্নীত হতে চায়। সেই সমস্ত মানুষেরা বৈদিক নির্দেশ শ্রবণ করার জন্য তাদের দক্ষিণ কর্ণ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু,

যারা তপোলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক অথবা কৃষ্ণলোকে যেতে চায়, তারা সেই সমস্ত লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য, শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

শ্লোক ৫২

আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ ।
গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্মদেন সমন্বিতঃ ॥ ৫২ ॥

আসুরী—আসুরী; **নাম**—নামক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকে; **দ্বাঃ**—দ্বার; **তয়া**—যার দ্বারা; **যাতি**—যেতেন; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **গ্রামকম্**—গ্রামক; **নাম**—নামক; **বিষয়ম্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের নগরীতে; **দুর্মদেন**—দুর্মদ দ্বারা; **সমন্বিতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

পশ্চিম দিকে ছিল আসুরী নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা দুর্মদের সঙ্গে গ্রামক নামক নগরীতে যেতেন।

তাৎপর্য

নগরীর পশ্চিম দিকের দ্বারটিকে বলা হয় আসুরী, কারণ তা বিশেষ করে অসুরদের জন্য। অসুর হচ্ছে তারা, যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, বিশেষ করে যৌন সুখ, যার প্রতি তারা অত্যন্ত আসক্ত। পুরঞ্জন বা জীব তার উপস্থের দ্বারা চরম সুখ উপভোগ করে, তাই সে গ্রামক নামক স্থানে যায়। জড় সুখভোগকে বলা হয় *গ্রাম্য,* এবং যেখানে মানুষ গভীরভাবে যৌন সুখভোগে লিপ্ত হয়, সেই স্থানটিকে বলা হয় গ্রামক। পুরঞ্জন যখন গ্রামক নামক স্থানে যেতেন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকত তাঁর বন্ধু দুর্মদ। *বিষয়* বলতে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, দেহের এই চারটি প্রয়োজনকে বোঝায়। *দুর্মদেন* শব্দটি এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—*দুর্* মানে দুষ্ট, বা 'পাপী', এবং *মদ* মানে 'মত্ততা'। জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জীবকে বলা হয় *মদ* বা উন্মত্ত। বলা হয়েছে—

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥ (*প্রেমবিবর্ত*)

কেউ যখন পিশাচগ্রস্ত হয়, তখন সে উন্মাদ হয়ে যায়। উন্মত্ত অবস্থায় মানুষ আবোল-তাবোল কথা বলে। তাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ে লিপ্ত হতে হলে, অত্যন্ত প্রবলভাবে ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়।

আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাঃ শব্দগুচ্ছটির আর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। সূর্যকে প্রথম দেখা যায় পূর্ব দিকে, বঙ্গোপসাগরে—এবং ধীরে ধীরে তা পশ্চিম দিকে গমন করে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পশ্চিম দিকের মানুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের ব্যাপারে অধিক আসক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই সম্বন্ধে বলেছেন—পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার (*চৈঃ চঃ আদি* (১০/৮৯)। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই দেখা যায় যে, মানুষেরা পারমার্থিক জীবনের প্রতি উদাসীন। দেখা যায় যে, তারা বৈদিক আদর্শের প্রতিকূল আচরণ করে। সেই কারণে, পাশ্চাত্যের মানুষেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অধিক আসক্ত। এই *ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাঃ।* অর্থাৎ, পাশ্চাত্যের মানুষেরা আসুরিক সভ্যতার প্রতি আগ্রহী। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে যেন প্রচারিত হয়, যাতে জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিরা তাঁর শিক্ষার প্রভাবে লাভবান হতে পারে।

শ্লোক ৫৩

নির্ঋতির্নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ ।
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

নির্ঋতিঃ—নির্ঋতি; **নাম**—নামক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকস্থ; **দ্বাঃ**—দ্বার; **ত্বয়া**—যার দ্বারা; **যাতি**—যেতেন; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **বৈশসম্ নাম**—বৈশস নামক; **বিষয়ম্**—স্থানে; **লুব্ধকেন**—লুব্ধক নামক বন্ধুর দ্বারা; **সমন্বিতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

পশ্চিম দিকস্থ আর একটি দ্বারের নাম নির্ঋতি। পুরঞ্জন সেই দ্বার দিয়ে তাঁর সখা লুব্ধকের সঙ্গে বৈশস নামক স্থানে গমন করতেন।

তাৎপর্য

এখানে পায়ু সম্বন্ধে বলা হয়েছে। চক্ষু, মুখ ও নাসিকার বিপরীত দিকে পায়ু অবস্থিত। এই দ্বারটি বিশেষভাবে মৃত্যুর দ্বার। সাধারণত মানুষ যখন তার দেহত্যাগ করে, তখন সে পায়ুর দ্বারা বহির্গত হয়। তাই তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কেউ যখন মলত্যাগ করে, তখনও সে বেদনা অনুভব করে। জীবের যে-সখাটি

এই দ্বার দিয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে থাকে, তার নাম হচ্ছে লুব্ধক, অর্থাৎ, 'লোভ'। লোভের ফলে আমরা অনর্থক আহার করি, এবং এই অত্যাহারের ফলে মলত্যাগ করার সময় বেদনা অনুভব হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, জীব যদি যথাযথভাবে মলত্যাগ করে, তা হলে সে সুস্থ অনুভব করে। এই দ্বার হচ্ছে *নির্ঋতি* বা বেদনাদায়ক দ্বার।

শ্লোক ৫৪

অন্ধাবমীষাং পৌরাণাং নির্বাক্‌পেশস্কৃতাবুভৌ ।
অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ ॥ ৫৪ ॥

অন্ধৌ—অন্ধ; **অমীষাম্**—তাদের মধ্যে; **পৌরাণাম্**—অধিবাসীদের; **নির্বাক্**—নির্বাক নামক; **পেশস্কৃতৌ**—পেশস্কৃৎ নামক; **উভৌ**—তারা উভয়ে; **অক্ষণ্-বতাম্**—যে ব্যক্তিদের চোখ আছে; **অধিপতিঃ**—শাসক; **তাভ্যাম্**—তাদের দুজনের সঙ্গে; **যাতি**—যেতেন; **করোতি**—করতেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সেই নগরীর বহু অধিবাসীর মধ্যে নির্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামক দুই ব্যক্তি ছিলেন। যদিও রাজা পুরঞ্জন ছিলেন চক্ষুষ্মান নাগরিকদের শাসক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এই অন্ধদের সঙ্গ করতেন। তাদের সঙ্গে ইতস্তত বিচরণ করে তিনি নানা প্রকার কার্য করতেন।

তাৎপর্য

এখানে জীবের হাত ও পায়ের কথা বলা হয়েছে। পা দুটি কথা বলে না এবং সেগুলি অন্ধ। কেউ যদি কেবল তার পায়ের উপর নির্ভর করে বিচরণ করে, তা হলে কূপের মধ্যে পতিত হতে পারে অথবা পাথরে হোঁচট লাগতে পারে। এইভাবে অন্ধ পায়ের দ্বারা পরিচালিত হলে, মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

কর্মেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে হাত ও পা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি নেই। অর্থাৎ, হাত ও পায়ে কোন ছিদ্র নেই। তাই এখানে হাত ও পাগুলিকে অন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও জীবের দেহে বহু ছিদ্র রয়েছে, তবুও তাকে হাত ও পায়ের সাহায্যে কাজ করতে হয়। জীব যদিও অন্য বহু ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তবু যখন তাকে কোথাও যেতে হয় অথবা কোন কিছু স্পর্শ করতে হয়, তখন তাকে অন্ধ পা ও হস্তকে ব্যবহার করতে হয়।

শ্লোক ৫৫

স যর্হ্যন্তঃপুরগতো বিষূচীনসমন্বিতঃ ।
মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্মজোদ্ভবম্ ॥ ৫৫ ॥

সঃ—তিনি; **যর্হি**—যখন; **অন্তঃ-পুর**—অন্তঃপুরে; **গতঃ**—যেতেন; **বিষূচীন**—মনের দ্বারা; **সমন্বিতঃ**—সাথে; **মোহম্**—মোহ; **প্রসাদম্**—সন্তোষ; **হর্ষম্**—হর্ষ; **বা**—অথবা; **যাতি**—উপভোগ করতেন; **জায়া**—পত্নী; **আত্ম-জ**—সন্তান; **উদ্ভবম্**—তাদের থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

কখনও কখনও তিনি বিষূচীন (মন) নামক তাঁর প্রধান ভৃত্যের সাথে তাঁর গৃহের অন্তঃপুরে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রভাবে মোহ, সন্তোষ ও হর্ষ উৎপন্ন হত।

তাৎপর্য

বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছে, *হৃদ্যয়ম্ আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ*—আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় কিন্তু আত্মা সত্ত্ব, রজ ও তম—এই জড় গুণগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন কেউ যখন সত্ত্বগুণে থাকেন, তখন তিনি সুখ অনুভব করেন; কেউ যখন রজোগুণে থাকেন, তখন তিনি জড় সুখভোগের মাধ্যমে প্রসন্নতা অনুভব করেন; এবং কেউ যখন তমোগুণে থাকেন, তখন তিনি মোহাচ্ছন্ন হন। এই সমস্ত মনের কার্যকলাপ, এবং সেগুলি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার স্তরে কার্য করে।

জীব যখন স্ত্রী, পুত্র ও কলত্রাদির দ্বারা পরিবৃত থাকে, তখন সে মানসিক স্তরে কার্য করে। কখনও সে অত্যন্ত সুখী হয়, কখনও সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়, কখনও সে অপ্রসন্ন হয়, এবং কখনও সে মোহাচ্ছন্ন হয়। সমাজ, মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মনে করে যে, তার সেই তথাকথিত সমাজ, মৈত্রী, প্রেম, জাতীয়তাবাদ, গোষ্ঠী, ইত্যাদি তাকে রক্ষা করবে। সে জানে না যে, তার মৃত্যুর পর সে অত্যন্ত প্রবল জড়া প্রকৃতির হস্তে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তার বর্তমান কর্ম অনুসারে তাকে একটি বিশেষ শরীর ধারণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করবে। সেই শরীরটি মানুষের শরীর নাও হতে পারে। অতএব সমাজ, স্ত্রীপুত্র ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে জীবের এই যে নিরাপত্তার অনুভূতি, তা মোহ ছাড়া আর কিছু

নয়। বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরে অবরুদ্ধ সমস্ত জীব জড় সুখভোগের জন্য তাদের বর্তমান কার্যকলাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। তারা তাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেছে, যা হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তারা সকলেই মোহাচ্ছন্ন বলে বুঝতে হবে। জড় বস্তুর মাধ্যমে তথাকথিত সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতিকেও মোহ বলে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম অথবা অন্য কোন কিছুই মানুষকে ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে একটি জীবকেও উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"ত্রিগুণাত্মিকা আমার দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত, তারা অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারে।" অতএব সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত না হলে, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৫৬

এবং কর্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ ।
মহিষী যদ্‌যদীহেত তত্তদেবান্ববর্তত ॥ ৫৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **সংসক্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **কাম-আত্মা**—কামুক; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত; **অবুধঃ**—নির্বোধ; **মহিষী**—রাণী; **যৎ যৎ**—যা কিছু ; **ঈহেত**—তিনি কামনা করতেন; **তৎ তৎ**—সেই সবই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্ববর্তত**—তিনি অনুকরণ করতেন।

অনুবাদ

এইভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং সকাম কর্মে আসক্ত হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাঁর মহিষীর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতেন।

তাৎপর্য

জীব যখন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন সে তার পত্নী বা জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। তখন তাকে ঠিক তার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, জাগতিক সুখের জন্য পত্নীকে গয়নাগাটি দিয়ে এবং তার কথামতো আচরণ করে, সর্বদা তাকে সুখী রাখা কর্তব্য। তা হলে আর পারিবারিক জীবনে কোন রকম অসুবিধা থাকবে না। তাই নিজের লাভের জন্য স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে কেউ যখন তার পত্নীর ভৃত্যে পরিণত হয়, তখন তাকে তার পত্নীর ইচ্ছা অনুসারে কার্য করতে হয়। তার ফলে মানুষ জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে যে, "কেউ যখন তার পত্নীর বিশ্বস্ত সেবকে পরিণত হয়, তখন তার মানসম্মান ধূলিসাৎ হয়।" কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে, পত্নীর আজ্ঞাকারী দাস না হলে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দেয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই অশান্তির ফলে, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন হয়েছে, এবং ভারতবর্ষের মতো আদি প্রাচ্যের দেশগুলিতেও স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষেও বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন প্রচলিত হওয়ার ফলে, সেই অশান্তিটি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে মন কাজ করছে, এবং পত্নীর বশীভূত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় বুদ্ধির বশীভূত হওয়া। এইভাবে মানুষ তার পত্নীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে এবং মানসিক জল্পনা-কল্পনার বশীভূত হয়ে, নানা প্রকার কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৫৭-৬১

ক্বচিৎপিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ ।
অশ্নন্ত্যাং ক্বচিদশ্নাতি জক্ষত্যাং সহ জক্ষিতি ॥ ৫৭ ॥
ক্বচিদ্গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদত্যাং রুদতি ক্বচিৎ ।
ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনু জল্পতি ॥ ৫৮ ॥
ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনু তিষ্ঠতি ।
অনু শেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্বচিচ্ছৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনু পশ্যতি ।
ক্বচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি ক্বচিৎ ॥ ৬০ ॥

ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ ।
অনু হৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনু মোদতে ॥ ৬১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **পিবন্ত্যাম্**—পান করার সময়; **পিবতি**—তিনি পান করতেন; **মদিরাম্**—মদিরা; **মদ-বিহ্বলঃ**—নেশাচ্ছন্ন হয়ে; **অশ্নন্ত্যাম্**—তিনি যখন আহার করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অশ্নাতি**—তিনি আহার করতেন; **জক্ষত্যাম্**—তিনি যখন চর্বণ করতেন; **সহ**—তাঁর সঙ্গে; **জক্ষিতি**—তিনি চর্বণ করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **গায়তি**—তিনি গান করতেন; **গায়ন্ত্যাম্**—তাঁর পত্নী যখন গান করতেন; **রুদত্যাম্**—তাঁর পত্নী যখন ক্রন্দন করতেন; **রুদতি**—তিনিও কাঁদতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **হসন্ত্যাম্**—তিনি যখন হাসতেন; **হসতি**—তিনিও হাসতেন; **জল্পন্ত্যাম্**—তিনি যখন গল্প করতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **জল্পতি**—তিনিও প্রজল্প করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ধাবতি**—তিনিও গমন করতেন; **ধাবন্ত্যাম্**—যখন তিনি গমন করতেন; **তিষ্ঠন্ত্যাম্**—তিনি যখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **তিষ্ঠতি**—তিনি দাঁড়াতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **শেতে**—তিনি শয়ন করতেন; **শয়ানায়াম্**—তিনি যখন বিছানায় শয়ন করতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **আস্তে**—তিনি উপবেশন করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **আসতীম্**—তিনি যখন উপবেশন করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **শৃণোতি**—তিনি শ্রবণ করতেন; **শৃন্বন্ত্যাম্**—তিনি যখন শ্রবণ করতেন; **পশ্যন্তাম্**—তিনি যখন কোন কিছু দেখতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **পশ্যতি**—তিনিও দেখতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **জিঘ্রতি**—তিনি ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন; **জিঘ্রন্ত্যাম্**—যখন তাঁর পত্নী ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন; **স্পৃশন্ত্যাম্**—তাঁর পত্নী যখন স্পর্শ করতেন; **স্পৃশতি**—তিনিও স্পর্শ করতেন; **ক্বচিৎ**—সেই সময়; **ক্বচিৎ চ**—কোন সময়ও; **শোচতীম্**—তিনি যখন অনুশোচনা করতেন; **জায়াম্**—তাঁর পত্নী; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **শোচতি**—তিনিও শোক করতেন; **দীন-বৎ**—অনাথের মতো; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **হৃষ্যতি**—তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন; **হৃষ্যন্ত্যাম্**—তিনি যখন আনন্দিত হতেন; **মুদিতাম্**—তিনি যখন প্রসন্ন হতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **মোদতে**—তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

অনুবাদ

রাণী যখন মদিরা পান করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে মদিরা পান করতেন। রাণী যখন আহার করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আহার করতেন,

এবং রাণী যখন চর্বণ করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করতেন। রাণী যখন গান করতেন, তখন তিনিও গান করতেন। তেমনই, রাণী যখন ক্রন্দন করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কাঁদতেন, এবং রাণী যখন হাসতেন, তখন তিনিও হাসতেন। রাণী যখন প্রজল্প করতেন, তখন তিনিও প্রজল্প করতেন, এবং রাণী যখন গমন করতেন, তখন রাজাও তাঁর পিছনে পিছনে গমন করতেন। রাণী যখন দাঁড়াতেন, তখন রাজাও দাঁড়াতেন, এবং রাণী যখন শয্যায় শয়ন করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে শয়ন করতেন। রাণী যখন বসতেন, তখন তিনিও বসতেন, এবং রাণী যখন কোন কিছু শ্রবণ করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তা-ই শ্রবণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু দেখতেন, তখন রাজাও তা দেখতেন, এবং রাণী যখন কোনও কিছুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, তখন রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে সেই বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু স্পর্শ করতেন, তখন রাজাও তা স্পর্শ করতেন এবং প্রিয়তমা রাণী যখন শোক করতেন, তখন বেচারি রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে অনাথের মতো শোক করতেন। তেমনই রাণী যখন আনন্দিত হতেন, তখন তিনিও আনন্দিত হতেন, এবং রাণী সন্তুষ্ট হলে, রাজাও সন্তোষ অনুভব করতেন।

তাৎপর্য

মন হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে আত্মা অবস্থিত, এবং মন পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা। জীবাত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে, বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। বুদ্ধিকে এখানে রাণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং আত্মা মনের নিয়ন্ত্রণাধীনে জড় বুদ্ধিকে অনুসরণ করে, ঠিক যেভাবে রাজা তাঁর পত্নীকে অনুসরণ করেন। তার অর্থ হচ্ছে জড় বুদ্ধিই জীবের বন্ধনের কারণ। তাই এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ অম্বরীষের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, সেই মহান রাজা সর্বপ্রথমে তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত করেছিলেন। তার ফলে তাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। তাঁর চক্ষুকে তিনি মন্দিরে সুন্দরভাবে ফুলের দ্বারা সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত ফুল ও তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে যুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর পা দুটিকে ভগবানের মন্দিরে গমন করার কার্যে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর হাত দুটিকে ভগবানের মন্দির মার্জন করার কাজে যুক্ত করেছিলেন, এবং

তিনি তাঁর কর্ণদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার কার্যে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর জিহ্বাকে দুভাবে যুক্ত করেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা বলার ব্যাপারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনের ব্যাপারে। সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারে না। এইভাবে তারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সেই তত্ত্বের সারমর্ম পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৬২

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ ।
নেচ্ছন্ননুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎক্রীড়ামৃগো যথা ॥ ৬২ ॥

বিপ্রলব্ধঃ—বন্দি; **মহিষ্যা**—মহিষীর দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রকৃতি**—অস্তিত্ব; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়ে; **ন ইচ্ছন্**—বাসনা না করে; **অনুকরোতি**—অনুকরণ করতেন; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ রাজা; **ক্লৈব্যাৎ**—বলপূর্বক; ক্রীড়া-**মৃগঃ**—পোষা জন্তু; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বন্দি হয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, এই জড় জগতে তিনি সর্বতোভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সেই মূর্খ রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি পোষা জন্তু তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিপ্রলব্ধঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *বি* মানে 'বিশেষভাবে', এবং *প্রলব্ধ* মানে 'প্রাপ্ত হয়েছিলেন'। রাজা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য রাণীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি জড় জগতের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। না চাইলেও তিনি জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পোষা জন্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। একটি পোষা বানর যেমন তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে নাচে, রাজাও ঠিক তেমন তাঁর রাণীর ইচ্ছানুসারে নাচতেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/২) বলা হয়েছে, *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*—কেউ যদি ভগবদ্ভক্ত সাধুর সঙ্গ করে, তা হলে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু কেউ যদি স্ত্রীসঙ্গ করে অথবা রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করে, তা হলে তার বন্ধনের পথ প্রশস্ত হয়।

মোট কথা হচ্ছে যে, পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের জন্য স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের তাৎপর্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্বে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার অভ্যাস করতে হয়। যৌন জীবন, তা সে বৈধই হোক বা অবৈধই হোক, পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে, মানুষ জড়-জাগতিক বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, কামবাসনা অথবা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করার একটি সুযোগ পাওয়া যায়। তা যদি করা যায়, তা হলে অনায়াসে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিসাধন করা যায়।

মানুষ যে কিভাবে তার প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ প্রভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই কথা নারদ মুনি এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নিজের পত্নীর প্রতি আকর্ষণের অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক গুণের প্রতি আকর্ষণ। যারা তমোগুণের দ্বারা আকৃষ্ট, তারা জীবনের সর্ব-নিম্ন স্তরে রয়েছে, আর যারা সত্ত্বগুণের দ্বারা আকৃষ্ট, তারা উন্নততর স্থিতিতে রয়েছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা জ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি অবশ্যই উন্নততর স্থিতি, কারণ জ্ঞান মানুষকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞানের স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতিসাধন করা যায় না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে ব্রহ্মভূত স্তরে বা আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে স্থিত হয়েছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তার ফলে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। সেই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভ করেন।"

জ্ঞানের স্তর শুভ কারণ তার ফলে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, কেউ যদি সরসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমাদের জড় অস্তিত্বের প্রকৃত জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তথাকথিত সমাজ, পরিবার, প্রেম এবং অন্যান্য সব কিছুর প্রতি বিরক্ত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমাজ, পরিবার ও জড়-জাগতিক প্রেমের প্রতি আসক্ত থাকি, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের কোন প্রশ্নই ওঠে না; ভগবদ্ভক্তিরও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে, হৃদয় জ্ঞান ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষের জীবন সার্থক হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।